উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য



# কৃষি-বিজ্ঞান।

A popular treatise on scientific agriculture.

Published by S. C. Sen & Brothers
163, Musjidbari Street.

GREAT TOWN PRESS : CALCUTTA.
1894.

# বিজ্ঞাপন।

কৃষিকার্য্য এদেশীয় মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর অধিকাংশ লোকের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায়। উহার উন্নতিসাধন দ্বারা দেশের বিস্তর উপকার হইতে পারে। পূর্ব্বাপেক্ষা শস্যাদি এক্ষণে মহার্ঘ হইয়াছে এবং অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে; তজ্জন্য প্রজাগণের অত্যন্ত দুরবস্থা হইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষার সহিত কৃষিবিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ হয়, সেজন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যত্নবান হইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যালয়পাঠ্য কৃষিবিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তকের অভাব আছে। আমি কলিকাতার বহুবাজারস্থ জমিদারি পঞ্চায়ত সভার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভ্য তাহেরপুরের সুযোগ্য জমিদার শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর মহোদয়ের অভিপ্রায়ানুসারে বিস্তর যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলন করিলাম।

উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষার্থী বালকগণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। বিজ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত কৃষির উন্নতি সুচারুরূপে হইতে পারে না, এজন্য কৃষির সহিত, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, রসায়ন, প্রাকৃতিক ভূগোল ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের যে সম্বন্ধ আছে তাহা অতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ছাত্রগণের সুবিধার্থ পুস্তকের শেষভাগে পরিশিষ্টে রসায়ন ও অন্যান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কঠিন শব্দ সমূহের উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও জর্ম্মনীদেশীয় সুবিখ্যাত

রসায়নবিদ কৃষকগণের পরীক্ষিত, উৎকৃষ্ট আধুনিক কৃষিপ্রণালী এবং বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কৃষকগণ যে প্রণালীর অনুসরণ করিয়া থাকে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করেন ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

কলিকাতা }
সন ১৮৯৪। } গ্রন্থকার।

# সূচী।

| বিষয়। | পৃষ্ঠা। |
| --- | --- |

# কৃষিবিজ্ঞান।

## প্রথম অধ্যায়।

### ভূমি।

আহারই জীবগণের প্রাণধারণের প্রধান উপায়। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি না থাকিলে খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। দয়াময় সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের জীবন ধারণোপযোগী শস্যাদি জন্মাইবার জন্য মৃত্তিকাকে উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিনা; তিনিই আমাদের সকল প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতার একমাত্র নিদান। যে দেশে কৃষিকার্য্য প্রচলিত নাই সে দেশের লোককে অতি ক্লেশকর মৃগয়া প্রভৃতি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হয়। পশুমাত্রেই তৃণ পত্র ও ফল মূল খাইয়া জীবিত থাকে, কিন্তু মনুষ্যগণ ঐ সকল বস্তু খাইয়া অধিক দিন প্রাণধারণ করিতে পারেনা; সুতরাং তাহাদিগকে আহারোপযোগী শস্য উৎপাদন করিয়া লইতে হয়। যে উপায় ও প্রক্রিয়া পরম্পরা অবলম্বন পূর্ব্বক শস্যোৎপাদন করা যায় তাহারনাম কৃষিকার্য্য।

কোন এক খণ্ড ভূমি হইতে তাহার উৎপাদিকাশক্তি নষ্ট না করিয়া অল্প ব্যয়ে অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান ফসল উৎপাদন করাই কৃষকের উদ্দেশ্য। কৃষিকার্য্যই আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর লোকগণের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায়। আমাদের দেশের কৃষক গণ প্রায়ই মূর্খ, কৃষি-কার্য্য দ্বারা স্ব, স্ব অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে অক্ষম সুতরাং কি উপায়ে উৎকৃষ্ট ও অপর্য্যাপ্ত ফসল জন্মে এবং কি কারণে শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হওয়ায় দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আপদ উপস্থিত হয়, কেমন করিয়াই বা তাহার প্রতীকার করা যায়, এ সকল বিষয়তাহারা কিছুই জানিতে পারেনা। পূর্ব্ব-পুরুষ ও প্রাচীন কাল হইতে যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে তাহারা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। যদি প্রয়োজন ও সময় মত বৃষ্টি হয় তবেই তাহারা কয়েক মাসের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, নচেৎ তাহাদের ক্লেশের সীমা থাকেনা।

কোন কোন দেশের লোক অনুর্ব্বর ক্ষেত্রকেও কৃষির উপযুক্ত উর্ব্বর করিয়া লইতে পারে। এ দেশের প্রায় সমস্ত ভূমিই স্বভাবতঃ যথেষ্ট উর্ব্বরা, অল্পব্যয়ে অনায়াসে সুচারু রূপে কৃষিকার্য্য হইতে পারে। জল বায়ুর প্রকৃতিও উক্ত কার্য্যের অনুকূল, তথাপি কৃষকগণ এবিষয়ে লাভবান না হইয়া ক্ষতি-গ্রস্তই হইয়া থাকে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কিছুই নাই।

আমাদের ভরণপোষণের সমস্ত দ্রব্যই কৃষিজাত। দেশের অভাবপূরণ হইলে উদ্বৃত্ত দ্রব্য বাণিজ্যের সাহায্যে অন্যান্য দেশে প্রেরিত হয়। কৃষিই বাণিজ্যের মূল, এবং বাণিজ্যই

দেশে অর্থাগমের উপায়; কিন্তু যে দেশ পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, সে দেশ হইতে শস্যাদি বিদেশে রপ্তানি করা অনিষ্ট জনক। কৃষিজাত অন্যান্য দ্রব্য বিদেশে পাঠাইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু মনুষ্য ও গবাদির আহার্য্য বস্তু দেশ বহির্ভূত যত না হয় ততই ভাল। এই উক্তির গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অর্থলোভে দেশের সার বস্তু বিক্রয় করতঃ অনিষ্টোৎপত্তির উপায় করিয়া রাখে।

যদি অর্থলোভ প্রবল হয়, তবে শস্যাদির বাণিজ্য বিদেশে অপেক্ষা দেশে করাই উচিত। বহির্বাণিজ্য দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা যে ক্রমে নষ্ট হইতে পারে ইহা কৃষক মাত্রেরই সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। সকলেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, দেশে আর পূর্ব্বের ন্যায় ফসল জন্মায় না; ইহার প্রকৃত কারণ কি তাহা কেহই অনুসন্ধান করেননা। লোকের বিশ্বাস যে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে কলিকালে বসুন্ধরা পাপভারাক্রান্ত হইয়া শস্য-হারিণী হইবে এবং ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ যথাকালে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন না।

কৃষিকার্য্য করিতে হইলে প্রথমে মৃত্তিকার গুণাগুণ ও উৎপত্তির বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কোন কূপ বা পুষ্করিণী খনন কালে পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভূপঞ্জর স্তরে স্তরে সজ্জিত। প্রত্যেক স্তরের মাটির রং ও প্রকৃতি একরূপ নহে। ঐ সকল স্তরের উর্দ্ধতমটীর সহিত কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধ, অতএব উহার উপরিভাগই আমাদের আলোচনার বিষয়। গলিত উদ্ভিদ, জীবদেহ বা কঙ্কালাদি ও নদীবাহিত পলিমাটি

উহার প্রধান উপকরণ। পর্ব্বতসমূহ বালি ও মাটির উৎপত্তি স্থান। রৌদ্র, বায়ু ও বৃষ্টির রাসায়নিক গুণে প্রস্তরাদির উপরিভাগ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হয়; পরে উহা বৃষ্টির জলে ধৌত ও বর্ষাকালের জলপ্লাবন সময়ে নদীপথে চালিত হইয়া তাহার অববাহিকা প্রদেশে সঞ্চিত হয়।

প্রতি বৎসর এইরূপে সন্নিহিত পাহাড় হইতে নূতন মৃত্তিকা উৎপন্ন ও নদীকর্তৃক সর্ব্বত্র সমভাবে চালিত হইতেছে। কোন কোন প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ বা ভগ্ন হইয়া প্রবল স্রোতঃ দ্বারা উচ্চপ্রদেশ হইতে নিম্নপ্রদেশে বাহিত হইবার সময় চূর্ণীকৃত হইয়া বালুকারূপে পরিণত হয়। সকল প্রকার মৃত্তিকাই প্রস্তর-স্তর হইতে উৎপন্ন হয় এবং উহার প্রধান উপাদান গুলিও ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তরের উপাদানের সদৃশ হইয়া থাকে। পাহাড়ের প্রকৃতির উপর জমির গুণাগুণ নির্ভর করে। মাটির উপরি ভাগে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে, কালক্রমে তাহা পচিয়া মাটিতেই মিশাইয়া যায়।

মাটিতে অনেকগুলি পদার্থ আছে। বালি, আটালমাটি, উদ্ভিজ্জজাত মাটি, নাইট্রোজেন, ফস্ফরস, গন্ধক, ক্ষার, লৌহ, চুণ, ম্যাগনেসিয়া প্রভৃতি ও কিয়ৎ পরিমাণে আছে। প্রথমোক্ত তিন প্রকার উপাদানের পরিমাণানুসারে মাটির ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে। যে মাটিতে বালির ভাগ অধিক, তাহাকে "বেলেমাটি" যাহাতে কর্দ্দম বা আটাল মাটি অধিক, তাহাকে "আটাল মাটি", এবং যাহাতে গলিত উদ্ভিজ্জ ও জীবদেহজাত মাটির ভাগ অধিক, তাহাকে "উদ্ভিজ্জজাত মাটি" কহা যায়।

আটাল মাটির কাদা পায়ে লাগিলে সহজে ছাড়ে না। যে মাটিতে চূণের ভাগ অধিক, তাহাকে চূর্ণামাটি বলা যাইতে পারে। যে মাটির উপর ঘুটিং জন্মে, তাহাতে চূণের অংশ থাকার সম্ভব, অথবা যে স্থানে চাথড়ি বা চূর্ণ-প্রস্তরের পাহাড় আছে, তথাকার মৃত্তিকায় চূণের অংশ অধিক।

যে সকল উপাদানের কথা উপরে উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে পটাস্, নাইট্রোজেন্ এবং ফস্ফরস্ প্রধান। উর্ব্বরা মাটিতে উহা যে পরিমাণে থাকা উচিত, তাহার হ্রাস হইলে, সে ভূমিতে আর কোন ফসলই ভাল জন্মে না। অতএব পুনঃ পুনঃ ফসল উৎপাদন দ্বারা যেমন ঐ সকল উপাদানের হ্রাস হয়, সেই রূপ যদি জমিতে আবার উহা যোগাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে জমির উর্ব্বরতার কোন ব্যাঘাত জন্মে না। এরূপ কোন উপায় বিধান করিতে পারিলেই কৃষিকার্য্যের অনেক উন্নতি হইয়া উহা লাভ জনক হইতে পারে।

সকল প্রকার উদ্ভিদই জমি হইতে ঐ পদার্থত্রয়কে ন্যূনাধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের পুষ্টিসাধন করে। এইরূপে ভূমি হইতে ঐ সকল পদার্থ, যে পরিমাণে ব্যয় হইয়া থাকে, যাহাতে সেই পরিমাণে তাহা পুনরায় ভূমিতে ফিরিয়া আসিতে পারে যথাসম্ভব তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যে সকল যৌগিক উপাদান ভূমিতে বর্ত্তমান আছে, উত্তাপ, ভূমিকর্ষণ, জলসিঞ্চনাদি কার্য্য দ্বারা তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়াই আবাদের কার্য্য। নাইট্রোজেন, পটাস, চূণ ও ফস্ফরস প্রভৃতি রূঢ়পদার্থ গুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যৌগিক অবস্থায় মৃত্তিকায়

বর্ত্তমান থাকিলে ফসলের কোন উপকার হয়না; কিন্তু ঐ রূঢ় পদার্থ গুলি জল, বায়ু, আলোক ও উত্তাপের সাহায্যে মৃত্তিকা হইতে গলিত, উন্মুক্ত ও দ্রবণীয় হইলে তদ্দ্বারা উদ্ভিদের পোষণ ও দেহনির্ম্মাণ কার্য্য চলিতে পারে।

তাপশোষণ, জলধারণাশক্তি এবং সছিদ্রতা প্রভৃতি মৃত্তিকার কয়েকটি "প্রাকৃতিক গুণ" থাকা আবশ্যক। যে মাটিতে জল বসে তাহা শীতল ও সছিদ্র, এজন্য কৃষিকার্য্যের অনুপযুক্ত। যে জমিতে সমপরিমাণে বালি ও আঁটাল মাটি থাকে, তাহারই সমস্ত প্রাকৃতিক গুণ গুলি থাকিবার সম্ভাবনা; সুতরাং কৃষিকার্য্যের পক্ষে তাহাই উৎকৃষ্ট। বৃষ্টির অভাবে মৃত্তিকার উপরিভাগ শুষ্ক হইলেও নিম্নের মৃত্তিকা সর্ব্বদাই ন্যূনাধিক সরস থাকে। উপরের মাটি সূর্য্য কিরণে যথেষ্ট উত্তপ্ত হইলেও কৈশিকাকর্ষণ প্রভাবে নিম্নস্থ সরস মৃত্তিকার জলীয়াংশ বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধগামী হইয়া, বৃষ্টির অভাব কিয়ৎ-পরিমাণে দূর করে।

সকল প্রদেশের মৃত্তিকা একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মাটির গুণও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, কোন স্থানে ধান্য ভাল জন্মে, কোন স্থানে গোধুম ও রবিশস্য ভাল জন্মে। সেই রূপ তুলা, রেসম, চা, নীল, কমলালেবু, আঙ্গুর প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ফলসমূহ একস্থানে যেমন ভাল হয়, অন্য স্থানে তেমন হয়না। শীত ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যাহা যাহা জন্মে, ভারত-বর্ষের স্থান বিশেষে সে সমস্তই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্য কোন দেশে এরূপ সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাঁহারা রসায়ন-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে জানেন যে, যে সকল রূঢ় পদার্থ জমির উর্ব্বরতার প্রধান উপকরণ, সে গুলি প্রায়ই মৃত্তিকার সহিত যৌগিক অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। সমস্ত যৌগিক পদার্থই কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বা আয়তনে রূঢ় পদার্থের মিলনে উৎপন্ন হয়। রূঢ় পদার্থসমূহের সংযোগে যে যৌগিক-পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার বাহ্য আকার, বর্ণ ও গুণ, রূঢ় পদার্থের গুণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যৌগিক পদার্থ হইতে উহার উপাদান গুলি প্রাকৃতিক ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা বিশ্লিষ্ট না হইলে, উদ্ভিদের কোন উপকারে আইসে না। মাটিতে বালি, আটালমাটি ও উদ্ভিজ্জজাত মাটি সচরাচর যে পরিমাণে মিশ্রিত থাকে, তাহাতে উহাদের পরিমাণের ভাগ কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই; সেই জন্য কোন মাটিকে যৌগিক পদার্থ বলাযায় না; কারণ ঐ সকল পদার্থের কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তন বা পরিমাণে রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা মাটি উৎপন্ন হয় নাই।

কেবলমাত্র বালিতে কোন ফসল জন্মেনা; অথবা কেবলমাত্র আটাল মাটিতেও কোন ফসল জন্মেনা। সকল মাটিতেই বালি, আটালমাটি ও চূণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত আছে। মৃত্তিকা হইতে প্রায় সমস্ত দ্রব্যই উৎপন্ন হয়; বৃক্ষ, ফল, মূল, শস্য, নানাবিধ প্রস্তর, চীনাবাসন, পাথরিয়া কয়লা, লৌহ হইতে স্বর্ণ হীরকাদি পর্য্যন্ত যাবতীয় বহুমূল্য প্রস্তরও ধাতুসমূহ মৃত্তিকার স্তর বিশেষে জন্মিয়া থাকে। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম এই যে, পরমাণুর কখনই ধ্বংস নাই,

কেবল রূপান্তর হয় মাত্র। অতএব উদ্ভিদ্গণ যে সকল পরমাণু মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করে এবং মনুষ্য ও গবাদি জন্তু যে তৃণ শস্যাদি খাইয়া জীবনধারণ করে, তাহার পরিত্যক্ত অংশ সার বা অন্য কোন রূপে দেশের জমিতেই মিশ্রিত হয়, কিন্তু ঐ সকল শস্য বিদেশে প্রেরিত হইলে, তাহার উপাদানসমূহ দেশ হইতে একেবারে বহির্গত হইয়া যায়। এইরূপে কোন দেশের জমির উর্ব্বরতার ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া থাকে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, যখন এদেশে বহির্বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব এত অধিক ছিলনা, তখন টাকায় আট মন করিয়া ধান্য বিক্রয় হইয়াছিল এবং দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে লোকে তাহা জানিত না। সে কাল আর নাই! অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিপ্রণালী উন্নত ও পরিবর্ত্তিত না হইলে, আর দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবেনা।

মাটিতে প্রধানতঃ দুইটি পদার্থ আছে, বালি (সিলিকা) এবং কর্দ্দম বা (এ্যালুমিনা)। আটাল মাটিতে কর্দ্দমের ভাগই অধিক। কর্দ্দমের অর্থ এখানে কাদা নহে। বালির লেশমাত্র নাই এরূপ মাটিকেই কর্দ্দম বলা যাইবে। যদি একখণ্ড মৃত্তিকা, ধূলিবৎ চূর্ণ ও পরিশুষ্ক করিয়া এক বোতল ফুটন্ত বৃষ্টিজলে নিক্ষেপ করতঃ কিছুক্ষণ উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া স্থির ভাবে রাখা যায়, তবে গুরুত্ব বশতঃ উহার সমস্ত বালি বোতলের নীচে পড়িবে। এক্ষণে কর্দ্দম মিশ্রিত জল পাত্রান্তরে ঢালিয়া স্থিরভাবে রাখিলে কর্দ্দমও নীচে পড়িবে। উপরের পরিষ্কৃত জল এই

সময়ে পৃথক করিলে, অবশিষ্ট বালি ও কর্দ্দমের পরিমাণ, ওজন করিয়া স্থির করিতে পারা যাইবে। যে মাটিতে বালির ভাগ অধিক তাহাকে "বেলেমাটি", যাহাতে বালির ভাগ অল্প তাহাকে "আটাল মাটি" যাহাতে চূণের ভাগ অধিক তাহাকে "চুণামাটি" এবং যে মাটিতে গলিত জীব ও উদ্ভিজ্জাবশেষ অধিক পরিমাণে থাকে তাহাকে "উদ্ভিজ্জজাত" মাটি কহে। মাটির এই শ্রেণী বিভাগ গুলি বিশেষরূপে মনে রাখা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাদ্বারা বালি ও কর্দ্দম পৃথক করা হইলে, যে পরিষ্কার জল অবশিষ্ট থাকে অগ্নির উত্তাপে উহার জলীয় ভাগকে বাষ্পাকারে উড়াইয়া দিলে, লবণ, সোডা, ম্যাগনেসিয়া, জিপসম্ পটাস, চুণ, প্রভৃতি মৃত্তিকার অন্যান্য উপাদানকে পৃথক করা যায়। ফস্ফরিক ও অন্যান্য এসিড সংযোগে ঐ সকল পদার্থ তরলাবস্থায় উক্ত জলে দ্রবীভূত থাকে। ঐ সকল খনিজ পদার্থ হইতেই উদ্ভিদগণ স্ব স্ব দেহ গঠনোপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করে এবং উদ্ভিদ দহন করিলে উহাদের ভস্মে সেই সকল খনিজ পদার্থ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জল হইতে ঐ সকল খনিজ উপাদান পৃথক করা বড় দুরূহ ব্যাপার।

যদি অল্পপরিমাণে মৃত্তিকাচূর্ণ শুষ্ক করিয়া একখানি লৌহ পাত্রে রাখিয়া বায়ুমধ্যে অগ্নিতে দগ্ধ করা যায়, তবে ঐ পাত্র লালবর্ণ হইয়া উঠিলে উহা শীতল করিয়া ওজন করিলে দেখা যায় যে, উহা আর পূর্ব্বের ন্যায় ভারী নাই। মৃত্তিকার যে অংশ দাহ্য, তাহা দহনকালে বায়ু সংযোগে বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়াছে এবং তাহার অদাহ্য

খনিজাংশ দহনের পর বর্ত্তমান আছে। প্রথমোক্ত অংশকে "জৈব" এবং শেষোক্ত অংশকে "অজৈব" বলা যাইবে। এই অদাহ্য খনিজ পদার্থগুলি পূর্ব্বোক্ত ফুটন্ত জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ ব্যতীত তাহাদিগকে পৃথক করা যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে একটী সম্পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট কোন উদ্ভিদকে দগ্ধ করিলে তাহার প্রায় সমস্তই পুড়িয়া যায়, কেবল অত্যল্প মাত্র ভস্মাবশিষ্ট থাকে; কিন্তু মৃত্তিকায় ঠিক উহার বিপরীত ফল দেখা যায়, অর্থাৎ অত্যল্প ভাগ পুড়িয়া যায় এবং অধিকাংশই অবশিষ্ট থাকে। মৃত্তিকার উৎকর্ষাপকর্ষ গুণাগুণ পরীক্ষা উল্লিখিত উপায় দ্বয় দ্বারা স্থূলতঃ একপ্রকার স্থিরীকৃত হইতে পারে। ফলতঃ দহনের পর যে মাটি ওজনে যত কমে তাহাই তত উর্ব্বরা অথবা উর্ব্বর-যোগ্য।

পূর্ব্বেই বলাগিয়াছে যে, ভূপঞ্জর অভ্রখণ্ডের ন্যায় স্তরে স্তরে রচিত। ঐ সকল স্তর বিভিন্ন জাতীয় প্রস্তর নির্ম্মিত। এক একটী স্তর ৫০ হইতে ১৫০০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর। উহাদের উপরিভাগ রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু প্রভাবে গলিত হইয়া কর্ষণোপ-যোগী জমি উৎপন্ন হয়। যে স্তরের যে উপাদান, তদুৎপন্ন মাটিতে ও সেই উপাদান বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং ভূমির উর্ব্বরতা অনুর্ব্বরতা বিচার করিতে হইলে ভূতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান অতিশয় প্রয়োজন।

বেলে পাথরের স্তর হইতে যে মাটি জন্মে তাহা বেলেমাটি; মেটে পাথরের স্তর হইতে যে মাটি জন্মে, তাহা আটাল মাটি এবং চা খড়ি বা চূর্ণ প্রস্তরের স্তর হইতে যে মাটি জন্মে, তাহাকে

চূণা মাটি বলে। যদি মিশ্রস্তর হয় তবে তদুৎপন্ন মাটিতে সকল উপাদানই ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। এই কারণে আমরা দেখিতে যাই যে, বর্দ্ধমান বিভাগের মৃত্তিকার বর্ণ ও প্রকৃতি একরূপ, উহাতে ধান্যজাতীয় ফসল উত্তম জন্মে। রাজসাহী বিভাগের মৃত্তিকার প্রকৃতি ও বর্ণ অন্যরূপ তাহাতে ধান্যজাতীয় ফসল, পাট, তামাক ও ইক্ষু উত্তম জন্মে, কিন্তু নীল ভাল হয় না। প্রেসিডেন্সি বিভাগের মৃত্তিকা আর এক প্রকার; তাহাতে আশুধান্য, তৈলদবীজ, রবিশস্য, নীল ও রেসম উত্তম জন্মে। কখন কখন এক জেলার মাটি অন্য জেলার মাটি হইতে ভিন্ন দেখা যায় এবং কোন কোন স্থানে এক-বর্গ মাইল পরিমিত স্থানের মধ্যে দুই তিন প্রকার মাটি দেখা যায়। উহাদের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন এবং তদুৎপন্ন শস্যের গুণের ও তারতম্য হইয়া থাকে।

স্তর সমষ্টিকে পাহাড় বলা যায়; সমুদয় পাহাড় স্তরযুক্ত ও স্তরবিহীন, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যে পাহাড়, স্তরে স্তরে সজ্জিত তাহাকে স্তরযুক্ত পাহাড় এবং যে পাহাড়ে তাদৃশ স্তর সমূহ লক্ষিত হয় না কেবল একটী সম্পূর্ণ স্তর মাত্র তাহাকে স্তরবিহীন পাহাড় বলে। স্তরযুক্ত পাহাড়ের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, কোন এক স্থানে উহার স্তর সকল যে পর্য্যায় ক্রমে অবস্থিত, অন্য যে কোন দেশেই হউক অথবা পৃথিবীর যে কোন স্থানেই হউক ভূস্তরের এই পর্য্যায় অবস্থানের বিপর্য্যয় কুত্রাপি দৃষ্ট হয়নী। এই জন্য কোন্ স্তর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের কত নিম্নে বা কত উর্দ্ধে আছে, উপরিস্থ স্তর দেখিলেই তাহা সহজে জানা যায়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্তরযুক্ত

পাহাড়কে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। "প্রাইমারি", "সেকেণ্ডারি", "টার্সিয়ারি", ও "পোষ্ট টার্সিয়ারি"। এই সকল স্তরের মধ্যে প্রাইমারি স্তর সকলের নিম্নে স্থাপিত, তদুপরি সেকেণ্ডারি স্তর এবং টার্সিয়ারি স্তর সর্ব্বোপরি স্থাপিত। এক একটী স্তর গঠিত হইতে যে কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। প্রাইমারি স্তর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং টার্সিয়ারি স্তর সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। কোন কোন স্তরের উপরি ভাগে বালি, কাঁকর, আটালমাটি ও প্রস্তর খণ্ডের যে এক একটী অগভীর স্তর দেখাযায় তাহাকে "পোষ্ট-টার্সিয়ারি" বা পরবর্ত্তী টার্সিয়ারি স্তর কহে। ভূপৃষ্ঠে যে স্থানে দুইটী স্তরের মিলন হয় সেখানকার ভূমি সচরাচর অধিক উর্ব্বরা হইয়া থাকে। এবং যে ভূমির নিম্নে বালুকা স্তর থাকে, কৃষিকার্য্যের পক্ষে সেইরূপ জমিই প্রশস্ত।

স্তরবিহীন পাহাড়কে সচরাচর আগ্নেয় বা স্ফাটিক পাহাড় কহে, কারণ উহা দেখিতে স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল মসৃণ এবং কতক গুলি নিয়মিত ধাতবস্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত। কত যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে উহারা অগ্নির প্রভাবে তরলাবস্থায় ছিল পরে কঠিন হইয়াছে। এই পাহাড় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, "গ্রানিট্" ও "ট্র্যাপ"। এই দুই পাহাড়ে স্তরের কোন লক্ষণ দেখা যায়না। পাহাড় পর্ব্বতাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত এবং ফেল্স্পার ও হরন্‌ব্লেণ্ড ইহার দুইটী প্রস্তরময় উপাদান। এই শেষোক্ত প্রস্তর দ্বয়ের রাসায়নিক উপাদান কি, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে তদুৎপন্ন মৃত্তিকার প্রকৃতি কিরূপ এবং কৃষিবিষয়ে উহাদের উপযোগিতা কি, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। লইস্ ও গিল্‌বার্ট নামক দুইজন বিখ্যাত

ইংলণ্ডীয় রসায়নবেত্তার মতে যে পাহাড়ে যে উপাদান আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

| প্রতি ১০০ ভাগে। | | ফেলস্পার। | | হরণব্লেণ্ড। |
|---|---|---|---|---|
| সিলিকা | ... | ৬৫ | ... | ৫২ |
| এলুমিনা | ... | ১৮ | ... | ১২ |
| পটাস্ ও সোডা | | ১৭ | ... | — |
| লাইম | ... | — | ... | ১০ |
| ম্যাগনেসিয়া | ... | — | ... | ১৫ |
| লৌহ অক্সাইড | | — | ... | ১০.৫ |
| ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড | | — | ... | .৫ |
| সমষ্টি | | ১০০ | | ১০০ |

ভূস্তর কিরূপে সজ্জিত থাকে উপরের চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ক, স্তরবিহীন পাহাড়, খ, গ, ঘ, ও চ প্রভৃতি স্তরময় পাহাড়। গ, ঘ ও চ তিনটী ভিন্ন ভিন্ন স্তর এবং ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল কিন্তু খ স্তরগুলি বক্রভাবে স্থাপিত আছে। স্তরবিহীন পাহাড় ক সকলের নিম্নে, তদুপরি খ স্তর এবং উপরিভাগে গ, ঘ, চ স্তর গুলি অবস্থিত। গ ও ঘ এবং ঘ ও চ প্রভৃতি

দুই স্তরের সংমিলন স্থানের মৃত্তিকা উর্ব্বর হইয়া থাকে। সকল স্তরের মৃত্তিকা এক প্রকারের নহে। স্তর গুলির এক এক প্রান্ত ভূপৃষ্ঠের উপরে শেষ হইয়াছে এজন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রানিট পাহাড়ের প্রধান উপাদান ফেল্‌স্পার ও কোয়ার্টজ এবং ট্র্যাপ পাহাড়ের প্রধান উপাদান ফেল্‌স্পার ও হরণব্লেণ্ড। ফেল্‌স্পার উভয় পাহাড়েরই সাধারণ উপাদান। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ফেল্‌স্পার ও হরণব্লেণ্ড নামক প্রস্তর বিশেষের উপাদানের যেমন বিভিন্নতা আছে, ঐ দুই প্রস্তর গলিত হইয়া যে মৃত্তিকা জন্মে, তাহারও তদনুরূপ গুণের পার্থক্য হইয়া থাকে।

গ্রানিট্ হইতে যে মাটি উৎপন্ন হয় তাহাতে ফেল্‌স্পারের উপাদান সিলিকা, এলুমিনা ও পটাস থাকিতেই চায়। ট্র্যাপ হইতে যে মাটি উৎপন্ন হয়, তাহাতে হরণব্লেণ্ডের উপাদান লাইম, ম্যাগনেসিয়া প্রভৃতি এবং পূর্ব্বোক্ত তিনটি পদার্থ থাকিতেই চায়।

উভয় প্রকার পাহাড়ে খনিজ পদার্থের সমষ্টি সাতটি মাত্র। তন্মধ্যে ফেল্‌স্পারে কেবল তিনটী মাত্র আছে এবং হরণব্লেণ্ডে উহার প্রায় সকল গুলিই অর্থাৎ ছয়টী আছে, কেবল মাত্র একটী নাই। অতএব ট্র্যাপজাত মৃত্তিকাতে খনিজ পদার্থের সংখ্যা ও পরিমাণ অধিক হওয়ায় এই মাটিতে সকল প্রকার উদ্ভিদ সতেজে বর্দ্ধিত হয় এজন্য উহা গ্রানিট্ জাত মাটি অপেক্ষা উর্ব্বর হইয়া থাকে। কিন্তু যদি হরণব্লেণ্ড ও ফেল্‌স্পার জাত উভয় প্রকার মৃত্তিকা মিশ্রিত করা

যায় তবে সেই মিশ্রিত মৃত্তিকা সচরাচর অধিকতর উর্ব্বরা হইয়া থাকে, কারণ এইরূপ মিশ্রণ দ্বারা একটীতে যে পদার্থের অভাব আছে, তাহা অন্যটীর দ্বারা পূরিত হইয়া পরস্পরের অভাব মোচন করতঃ ভূমি উর্ব্বরা হইয়া থাকে।

ট্র্যাপ পাহাড়ে যদি হরণব্লেণ্ড অধিক থাকে তবে উহা গলিত হইয়া যে মাটি জন্মে, তাহাতে প্রত্যেকের মনকরা প্রায় পাঁচ সের চূর্ণ, ম্যাগনেসিয়া ও লৌহঅকসাইড বর্ত্তমান থাকে। ঐ সকল পদার্থই উদ্ভিদের যথেষ্ট উপকারী। হরণব্লেণ্ড ও ফেল্‌স্পার উভয়ের সংমিশ্রণে যে মাটি জন্মে তাহাও উর্ব্বর, কারণ হরণব্লেণ্ড প্রায়ই পটাস ও সোডা শূন্য, কিন্তু এই দুই পদার্থের অভাব ফেল্‌স্পার দ্বারা পূরিত হয়, তদ্ব্যতীত হরণব্লেণ্ডে যে পরিমাণ চূর্ণ ও ম্যাগনেসিয়া আছে তাহাও উদ্ভিদের বিশেষ উপকারী। রসায়নবেত্তাগণ নানাবিধ ট্র্যাপ ও গ্রানিট জাত মৃত্তিকার প্রকৃতি ও উপাদানের পার্থক্য বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারেন এবং সেই জ্ঞান দ্বারা কৃষিকার্য্যে ঐ দুই প্রকার মৃত্তিকার উপযোগিতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিনব তত্ত্ব নির্ণয় করতঃ কৃষির উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

পরীক্ষা ও বহুদর্শন দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গ্রানিট্‌জাত মৃত্তিকা অনুর্ব্বর, এবং ট্র্যাপজাত মৃত্তিকা উর্ব্বর হইয়া থাকে; কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ হইলে দ্বিতীয়টির সংযোগে প্রথমটীর অনুর্ব্বরতা দোষ অন্তর্হিত হইয়া যায়। গ্রানিট ও ট্র্যাপজাত মৃত্তিকার ইহাই যদিও সাধারণ নিয়ম, তথাপি কখন কখন এরূপ ঘটে যে, গ্রানিট্ প্রস্তরে অভ্র, হরণব্লেণ্ড অথবা অন্যান্য খনিজ

উপাদানের আধিক্য বশতঃ গ্রানিটজাত মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা হইয়া থাকে। আবার ট্র্যাপ পাহাড়ের উপাদানের কখন কখন এত ন্যূনাধিক্য হয় যে, তজ্জাত মৃত্তিকা সম্পূর্ণ অনুর্ব্বরা হইয়া থাকে।

জমি যে স্তরের উপর স্থাপিত অর্থাৎ উপরিস্থ জমির অব্যবহিত নিম্নেই যে স্তর আছে, তাহা অনেক সময় চিনিতে পারা যায় না। কারণ আমাদেরদেশের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট বর্ষাবিশিষ্ট ও নদীবহুল দেশে উপরের স্তর সচরাচর নদীবাহিত পলিমাটি ও জীব এবং উদ্ভিজ্জাবশেষের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। এই পলিমাটির প্রকৃতি, সন্নিহিত পাহাড় পর্ব্বতাদি এবং যে সকল স্তরের উপরি ভাগ দিয়া নদী বেগে প্রবাহিত হয়, তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে উর্ব্বরা বা অনুর্ব্বরা হইয়া থাকে; সুতরাং নিম্নস্তরের মৃত্তিকা যেরূপ, উপরের মৃত্তিকা সেরূপ হয়না। গঙ্গা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী এবং উাহাদের উপনদী ও অসংখ্য শাখা প্রশাখা দ্বারা নিম্ন বঙ্গ এরূপ ভাবে সমাকীর্ণ যে তথায় এমন কোন জনপদ নাই যাহা কোন না কোন নদী হইতে অনধিক দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। নিম্নস্থ স্তর যেরূপ, উপরিস্থ জমির গুণাগুণ যদিও স্বভাবতঃ সে রূপ হয় তথাপি পূর্ব্বোক্তরূপ কতকগুলি কারণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। যাহা হউক কোন জেলার ভূতত্ত্ববিষয়ক জরীপের মানচিত্র দৃষ্টে এবং সেই জেলার প্রাকৃতিক অবস্থান, পাহাড় পর্ব্বত ও উচ্চ স্থানাদির সান্নিধ্য, বায়ু ও জল প্রবাহের দিক প্রভৃতি নৈসর্গিক ও স্থানীয় কারণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই উপরিস্থ মৃত্তিকার স্বভাব বিশেষ রূপে জানিতে পারা যায়।

যে ভূস্তর সকল একই সময়ে গঠিত তাহারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থিত হইলেও তদুপরিস্থ মৃত্তিকাও সচরাচর সমপ্রকৃতিক হইয়া থাকে। আমেরিকায় আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলস্থ ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স প্রদেশে যে সেকেণ্ডারি চাখড়ির স্তর আছে, তাহা স্বভাবিক অতিশয় শুষ্ক এজন্য তদুপরিস্থ অধিবাসী দিগের অত্যন্ত জল কষ্ট হইয়া থাকে। ৪০০ হইতে ৬০০ ফুট পর্য্যন্ত কূপ খনন না করিলে জল পাওয়া যায় না। এই প্রদেশের বায়ু, জলীয়বাষ্প রহিত এবং অত্যন্ত শুষ্ক এজন্য কৃষিকার্য্যের অনুকূল নহে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইলে প্রচুর কার্পাস জন্মে।

ইংলণ্ডের যে স্থানে ঐ স্তর দৃষ্ট হয় সেখানকার লোকেরও জলকষ্ট অধিক ও তত্রত্য বায়ু অতিশয় শুষ্ক, পূর্ব্বোক্ত রূপ গভীর কূপ খনন না করিলে জল পাওয়া যায় না এবং ঋতুর প্রকৃতি অনুসারে কোন কোন শস্য জন্মে, কিন্তু প্রচুর জলসিঞ্চন আবশ্যক। অধিক মূলধন ব্যতীত এবং উৎকৃষ্ট কৃষিপ্রণালী অবলম্বন না করিলে, ঐরূপ জমিতে লাভ হয় না। আমাদের দেশের ভূপৃষ্ঠ ঐরূপ স্তরময় নহে। এখানকার মৃত্তিকার নিম্নস্থ জলসমোচ্চতা সীমা অনতিগভীর। কূপ খনন করিলে কেবল উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভিন্ন কোন স্থানে ৫।৬ হাত কোন স্থানে ৮।৯ হাত এবং কোন কোন স্থানে ২০।২৫ হাতের নিম্নেই জল পাওয়া যায়। এই জল-সীমার অব্যবহিত উপরেই বালুকাস্তর থাকে। এই প্রাকৃতিক সুবিধার সহিত যদি উৎকৃষ্ট কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে কৃষিকার্য্যে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাহাড় গলিত ও নদীদ্বারা চালিত হইয়া যে মৃত্তিকাস্তর

জন্মে, উহার মাটিতে তিনটি গুণ বা অবস্থা আছে : যথা, “প্রাকৃতিক”, “রাসায়নিক” এবং “ঔদ্ভিদিক”। মাটির গুরুত্ব, জল বা জলীয়বাষ্প পরিশোষণ ও জল-ধারণশক্তি, সছিদ্রতা ও উত্তাপ, এই কয়েকটিকে মৃত্তিকার প্রাকৃতিক গুণ কহে। উদ্ভিদ পোষণোপযোগী জৈব ও খনিজ পদার্থ সমূহ স্বভাবতঃই যে ভূমিতে উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, তাহাকেই উহার রাসায়নিক অবস্থা বলা যায়।

কোন মাটি অন্য মাটি অপেক্ষা ভারী; বালি, মাটির দ্বিগুণ ভারী; আটাল মাটি সমান আয়তনের বেলে মাটির একচতুর্থাংশ লঘু। প্রথম কর্ষণ সময়ে বালি ও আটাল মাটি মিশ্রিত করিয়া উদ্ভিজ্জজাত মাটিকে ভারী করিতে হয়। কঠিন আটাল মাটির শতকরা ৫০ ভাগ জলধারণ-শক্তি থাকিলেও দেখিতে উহা সম্পূর্ণ শুষ্ক। বিশুদ্ধ বালির শতকরা ৫ ভাগ জলীয়বাষ্পধারণ শক্তি নাই। আটাল মাটির জলধারণশক্তি বালির অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ অধিক; কিন্তু উদ্ভিজ্জজাত মাটির তদপেক্ষাও অধিক। এই জন্য অন্যান্যমাটি অপেক্ষা আটালমাটির জলনিঃসরণ বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

জলনিকাশ, নালা নর্দ্দমা দিয়া হইতে পারে, কিন্তু এস্থলে মাটির নিম্ন দিয়া প্রস্তুত হওয়া বুঝিতে হইবে। শেষোক্ত জলনিঃসরণের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া আছে। প্রথমতঃ মাধ্যা-কর্ষণ শক্তিতে ভূমির উপর হইতে নিম্নে প্রবাহ, দ্বিতীয়তঃ কৈশিকাকর্ষণ শক্তিতে নিম্নস্থ জলপ্রবাহ বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ প্রবাহের কার্য্য কৃষকগণের বিশেষ মনোযোগের বিষয়। মৃত্তিকা রৌদ্রে শুষ্ক হইলে সঙ্কুচিত

হয়। আটাল ও উদ্ভিজ্জজাত মাটি মিশ্রণের পরিমাণানুসারে অল্প বা অধিক সঙ্কুচিত হয়। অধিক সঙ্কুচিত হইলে উদ্ভিদ মূলে চাপাধিক্য প্রযুক্ত, আলোক ও বায়ু প্রবেশপথ রুদ্ধ হইয়া যায়। এই কারণে সকল মৃত্তিকাতেই উপযুক্ত পরিমাণে বালি ও আটাল মাটির সংমিশ্রণ থাকা আবশ্যক।

বালি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না এবং আটালমাটি দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত প্রচুর জলীয়বাষ্প ধারণ করিতে পারে। গ্রীষ্ম-কালে বালি হইতে একদিনে যে পরিমাণ জল বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, অন্য দুই প্রকার মৃত্তিকা হইতে সেই পরিমাণ জলীয় বাষ্প উড়িয়া যাইতে তিন দিন লাগে এবং বৃষ্টির সময়েও বেলে-মাটি অল্প জল ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। এই জন্য গ্রীষ্মকালে বা অনাবৃষ্টির সময়ে বেলে জমির ফসল শীঘ্র মরিয়া যায় ও অতি বৃষ্টির সময়ে উহার জল শীঘ্রই নিঃসৃত বা বাষ্পীভূত হইয়া উদ্ভিদকে সতেজ রাখে। কিন্তু আটালমাটির ঐরূপ অবস্থা হইলে অতিরিক্ত জলহেতু উদ্ভিদ সকল পচিয়া বা মরিয়া যাইতে পারে।

গ্রীষ্ম কালের দিবাভাগে আর্দ্র মৃত্তিকা হইতে যেমন জলীয় বাষ্প উত্থিত হয়, রাত্রিকালে আবার সেই পরিমাণে জলীয় বাষ্প শোষিত হয়। বালি অতি অল্প বাষ্পশোষণ করে, কিন্তু আটাল মাটি তাহার ওজনের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ এবং উদ্ভিজ্জজাত মাটি তাহার ওজনের বার ভাগের এক ভাগ জলীয়বাষ্প শোষণ করে। অতএব কোন জমিতে শেষোক্ত দুই প্রকার মাটির মিশ্রণ কৃষিকার্য্যের কত আবশ্যক তাহা বুঝা যাইতেছে। মাটিতে উত্তাপ থাকাও বিশেষ প্রয়োজন, সূর্য্য

এই তাপের মূল। সূর্য্যকিরণে সকল প্রকার মাটি সমভাবে উত্তপ্ত হয় না।

উত্তাপ উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। মৃত্তিকাস্থিত অনেক যৌগিক পদার্থের উপাদান এই তাপ দ্বারা গলিত ও উন্মুক্ত হইয়া উদ্ভিদ পোষণের সহায়তা করে। যে মাটিতে জল বসে তাহা শীতল ও কৃষিকার্য্যের অনুপযুক্ত; কিন্তু উহাই আবার জল নিঃসরণ ও মিশ্রণ দ্বারা তাপধারক করা যাইতে পারে। বালি ও মাটি প্রায় সমান উত্তপ্ত হয়। রক্তাভ-ধূসরবর্ণ মৃত্তিকা উহা অপেক্ষা অধিক এবং কৃষ্ণবর্ণ উদ্ভিজ্জাত মাটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়। আটাল ও উদ্ভিজ্জজাত মাটির তাপশোষণ বিষয়ে অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। উভয়েরই জলধারণশক্তি সমান, উভয়েই ধীরে ধীরে জলীয় বাষ্পত্যাগ করে, ও শুষ্কাবস্থায় অধিক সঙ্কুচিত হয় এবং রৌদ্রের অবর্ত্তমানে বায়ু হইতে অধিক বাষ্পশোষণ করে। এজন্য এই দুই প্রকার মৃত্তিকার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়। অনুর্ব্বর বালিকেও উহাদের মিশ্রণে অনায়াসে কৃষিযোগ্য করা যাইতে পারে।

উদ্ভিদ সমূহ মৃত্তিকা মধ্যে স্ব স্ব মূল বিস্তার করতঃ সরল ভাবে মাটিতে আবদ্ধ থাকিয়া রসাকর্ষণ করে। ঐ রস রাসায়নিক ক্রিয়া ফলে মৃত্তিকা মধ্যেই ক্রমশঃ প্রস্তুত হয়। চুণ, বালি, লবণসদৃশ কতকগুলি দ্রবণীয় খনিজ পদার্থ, ও জৈব উপাদান মাটিতে অল্প পরিমাণে থাকে। জমি সম্পূর্ণ উর্ব্বর হইলে ঐ সকল পদার্থ ব্যতীত উহাতে উৎপৎস্যমাণ উদ্ভিদের ভস্মাবশেষে যে যে পদার্থ দৃষ্ট হয় তাহাও অন্ততঃ সামান্য পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। উদ্ভিদ ভস্মে সচরাচর যে সকল

খনিজ পদার্থ দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে অনেকগুলি নিম্নের তালিকায় লিখিত হইযাছে। উর্ব্বরা ক্ষেত্রের উপরের ও নীচের মাটিতে ঐ সকল উপাদানের কিঞ্চিৎ তারতম্য হইয়া থাকে। উপরের মাটি বলিলে এস্থলে উপরিস্থ মাটি অর্থাৎ যাহার উপর উদ্ভিদাদি জন্মে তাহাই বুঝিতে হইবে এবং নীচের মাটি বলিলে উহারই নিম্নস্থ স্তরের মাটি বুঝিতে হইবে। অধ্যাপক এণ্ডার্সন নামক জনৈক ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত তদ্দেশস্থ দুইটী স্থানের উপর ও নিম্নস্তরের মাটির উপাদান বিষয়ক যে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাই এখানে দেওয়া গেল।

| প্রতি ১০০ ভাগে। | (১) উপরের মাটীতে। | (২) নীচের মাটিতে। |
|---|---|---|
| সিলিকা ... | ৬১.১৬ ... | ৬২ |
| পারকসাইড অবআইরণ | ৫ ... | ৬ |
| এলুমিনা ... | ১৪ ... | ১৪ |
| লাইম ... | ১ ... | ১.২৫ |
| ম্যাগনেসিয়া ... | ১ ... | ১ |
| পটাস ... | ৩ ... | ২ |
| সোডা ... | ১.৫০ ... | ১ |
| সল্‌ফিউরিক এসিড | .১০ ... | —— |
| ফস্ফরিক ঐ | .২৪ ... | .২৫ |
| ক্লোরিণ ... | —— | —— |
| জৈব পদার্থ ... | ৯ | ৭ |
| জলীয়াংশ ... | ৩ | ৪.৫০ |
| সমষ্টি | ১০০ | ১০০ |

স্তরময় ও স্তরবিহীন পাহাড়জাত মাটিতে উদ্ভিদ পোষণ-যোগ্য প্রায় সকল পদার্থ অল্প পরিমাণেও থাকে। জমিতে সেই সকল পদার্থ না থাকিলে বা অনুপযুক্ত পরিমাণে থাকিলে, উহাতে ফসলাদি সতেজে বর্দ্ধিত হয় না, অথবা যে সকল ফসল অল্পকালের মধ্যেই পরিপক্ক হইয়া ছেদনোপযুক্ত হয় তাহাদের পোষণযোগ্য উপকরণ সমূহ মৃত্তিকামধ্যে প্রস্তুত হইতে তদপেক্ষা আরও অধিক সময় আবশ্যক। কিন্তু যে ফসল দীর্ঘ কাল জমিতে থাকে অর্থাৎ যাহা বৎসরের মধ্যে একই জমিতে কেবল একবার মাত্র উৎপন্ন হয়, সেই ফসলই পূর্ব্বোক্ত জমিতে ভাল জন্মে। স্প্রেঞ্জেল নামক জর্ম্মনী দেশীয় একজন বিখ্যাত রসায়নবেত্তা তদ্দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উর্ব্বর ও অনুর্ব্বর ভূমির যেরূপ সাধারণ ও বিশেষ বিয়োজন করিয়াছেন নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

| প্রতি ১০০০ ভাগে। | প্রথম জমি। | দ্বিতীয় জমি। | তৃতীয় জমি। |
|---|---|---|---|
| (ক) দ্রবণীয় খনিজ পদার্থ | ১৮ | ১ | ১ |
| (খ) বিশুদ্ধ মাটি ও জৈবপদার্থ | ৯৩৭ | ৮৩৯ | ৫৯৯ |
| (গ) সিলিকা বা বালি | ৪৫ | ১৬০ | ৪০০ |
| সমষ্টি | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |

(১) প্রথমটি উর্ব্বরা আটাল জমি, পূর্ব্বে জোয়ারের সময় প্লাবিত হইত, এক্ষণে সে সীমা অতিক্রম করিয়া উচ্চ জমিতে

পরিণত হইয়া ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত বিনা সারে সমভাবে শস্যোৎপাদিত হইতেছে। দ্বিতীয় জমি উর্ব্বর; ঘাস, শস্য, শালগম ও আলু উহাতে জন্মে, বিশেষতঃ জিপ্‌সম্‌ নামক সার প্রয়োগ করিলে আলু, গাজর, শালগম প্রচুর জন্মে। তৃতীয় জমি অনুর্ব্বর, উহাতে কিছুই ভাল জন্মেনা। যদি ঐ তিন প্রকার জমি হইতে প্রত্যেকের এক একখণ্ড মাটি লইয়া (৮ও ৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রূপে) প্রত্যেকের উপাদান পৃথক করা যায়, তবে প্রত্যেক মাটি হইতে প্রতি সহস্রভাগে যাহা যাহা পাওয়া যায়, উল্লিখিত তালিকায় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রথম জমি বোধহয় সমুদ্রবারি হইতেই উহার দ্রবণীয় লাবণিক পদার্থ গুলি প্রাপ্ত হইয়াছে। উহাতে লবণ, ক্লোরাইড এবং সল্‌ফেট্‌ অব পটাসিয়ম, জিপসম, সলফেট অব ম্যাগনেসিয়ম, সোডিয়ম ও অল্প মাত্রায় লৌহ আছে। পূর্ব্বোক্ত পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় অন্য কোন রূপ সার প্রয়োগের আবশ্যক হয় না, অথচ বহু কাল পর্য্যন্ত উহার উর্ব্বরতার হ্রাস হয় নাই।

তৃতীয় জমিতে শতকরা ৪০ ভাগ অর্থাৎ উহার পাঁচ ভাগের দুই ভাগ বালি থাকায় এস্থলে অনুর্ব্বরা হইয়াছে; কিন্তু কোন কোন জমিতে এই পরিমাণে বালি থাকিলেও আবার উর্ব্বর হইয়া থাকে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে উল্লিখিত তিন প্রকার মাটিকে সম্পূর্ণরূপে বালি ও দ্রবণীয় পদার্থহইতে পৃথক করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারই প্রতি সহস্র ভাগে নিম্ন লিখিত উপদান সকল দৃষ্ট হয়।

| প্রতি ১০০০ ভাগে। | | প্রথম জমি। | দ্বিতীয় জমি। | তৃতীয় জমি। |
|---|---|---|---|---|
| জৈব পদার্থ | ... | ৯৭ | ৫০ | ৪০ |
| সিলিকা | ... | ৬৪৮ | ৮৩৩ | ৭৭৮ |
| এলুমিনা | ... | ৫৭ | ৫১ | ৯১ |
| লাইম্ | ... | ৫৯ | ১৮ | ৪ |
| ম্যাগনেসিয়া | ... | ৮.৫ | ৮ | ১ |
| লৌহ অকসাইড | ... | ৬১ | ৩০ | ৮১ |
| ম্যাঙ্গানিজ অকসাইড | | ১ | ৩ | .৫ |
| পটাস | ... | ২ | ০ | ০ |
| সোডা | ... | ৪ | ০ | ০ |
| এমোনিয়া | ... | ০ | ০ | ০ |
| ক্লোরিণ | ... | ২ | ০ | ০ |
| সলফিউরিক এসিড | ... | ২ | .৭৫ | ০ |
| ফস্ফরিক এসিড | ... | .৪.৫ | ১.৭৫ | ০ |
| কার্ব্বনিক এসিড | ... | ৪০ | ৪.৫ | ০ |
| পরিশুষ্কতাহেতু ওজন হ্রাস | | ১৪ | ০ | ৪.৫ |
| সমষ্টি | | ১০০০ | ১০০০ | ১০০০ |

প্রথম জমিতে উর্ব্বরতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় পদার্থ, নাইট্রোজন ও এমোনিয়ার প্রধান আধারস্বরূপ জৈব পদার্থের শতকরা ১০ ভাগ এবং চূণ শতকরা ৬ ভাগ আছে। এতদ্ব্যতীত সোডা, ও এসিড যথেষ্ট থাকায় উহা সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট জমি।

দ্বিতীয় জমি অল্প উর্ব্বরা কিন্তু সার প্রয়োগ করিলে অধিক উর্ব্বরা হইতে পারে। উহাতে দ্রবণীয় পদার্থের পরিমাণ অল্প, কিন্তু অদ্রবণীয় পদার্থ,সোডা, পটাস ও এসিড নাম মাত্র আছে। জৈব পদার্থ শতকরা ৫ ভাগ এবং চূণ ২ ভাগ থাকায় কৃত্রিম উপায়ে ও বিজ্ঞ কৃষকের যত্নে ঐ জমি উর্ব্বরা হইতে পারে।

তৃতীয় জমি অনুর্ব্বরা, উহাতে জৈব পদার্থ শতকরা ৪ ভাগ, চূণ অর্দ্ধ ভাগ, বালি ৪০ ভাগ, দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় পদার্থ প্রায় নাই, কিন্তু শতকরা ৮ ভাগ লৌহঅকসাইড বর্ত্তমান আছে। সার প্রয়োগ দ্বারা যদিও অন্যান্য পদার্থের অভাব পূরণ করিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলেও লৌহ অধিক পরিমাণে থাকায় উদ্ভিদের পক্ষে বিষবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের সম্পূর্ণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা উহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ পদার্থ আছে এবং কোন্ কোন্ পদার্থ নাই তাহা কত সহজে জানা যায় এবং তদনুরূপ কার্য্য করিলে কৃষিকার্য্যের অনেক উন্নতি হইতে পারে।

প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গুণ ব্যতীত ভূমির সহিত উদ্ভিদের আর একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহাকে উহার ঔদ্ভিদিক সম্বন্ধ বলা যায়। কোন জমিতে স্বভাবতঃই এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মে, অন্য প্রকার উদ্ভিদ ভালরূপ জন্মেনা। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, কোন স্থানে ধান্য উৎকৃষ্ট জন্মে, কোন স্থানে রবিশস্য বা ফল মুল উৎকৃষ্ট জন্মে। তামাক, পাট, ইক্ষু নীল, চা, কার্পাস প্রভৃতি স্থান বিশেষে যেমন ভাল জন্মে অন্য স্থানে সেরূপ হয় না। ইহার কারণ এই যে, যে জাতীয় উদ্ভিদের পৌষণোপযোগী পদার্থ সমূহ যে জমিতে স্বভাবতঃই প্রচুর

পরিমাণে আছে, সেই জমিতেই উহা অন্য জমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপে জন্মিয়া থাকে। যতদূর সম্ভব এই বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া কৃষিকার্য্য করা উচিত। চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা কোন ভূমিখণ্ডের উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারা যায়বটে, কিন্তু তদপেক্ষা যে জমিতে যাহা ভাল জন্মে সে জমিতে তাহার চাষ করাই ভাল। ব্রহ্মদেশে সেগুণ স্বভাবতঃই যথেষ্ট জন্মে, হিমালয়ের নিম্নস্থ তরাই প্রদেশে উহা প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু শালজাতীয় বৃক্ষ এবং কোন কোন স্থানে শিশু বৃক্ষ অনেক জন্মে। হিমালয়ের উপরি ভাগে স্থানে স্থানে শালজাতীয় ও স্থানে স্থানে দেবদারু জাতীয় উদ্ভিদ দৃষ্ট হয়।

কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে, এক স্থানে ক্রমাগত কয়েক বৎসর দূর্ব্বা ঘাস জন্মিল, পরে সেই জমিতে কয়েক বৎসর ধান্য জাতীয় ফসল উৎপাদিত হইয়া পতিত রাখিলে উহাতে হয়ত দূর্ব্বাঘাস না জন্মিয়া অন্য কোন প্রকার আগাছা জন্মে; অতএব, মৃত্তিকার উপাদানের তারতম্য হইলে অন্য উদ্ভিদের আবির্ভাব হইতে পারে। ভূমির কতকগুলি উপাদান ক্রমাগত কিছু দিন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইলে সেগুলি নিঃশেষ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু অন্যান্য উপাদান অব্যাহত অথবা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এজন্য এক জাতীয় উদ্ভিদ নির্ম্মূল করিলে সেই জমিতে অন্য জাতীয় উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়।

ধান্যজাতীয় ফসল প্রদেশবিশেষে যেমন উৎকৃষ্ট জন্মে বিশেষ চেষ্টা করিলেও অন্য স্থানে সেরূপ জন্মাইতে পারা যায় না। কোন প্রদেশের রবিশস্য হয়ত ভালরূপ সিদ্ধ হয়না, অথবা সিদ্ধ করিতে অধিক সময় আবশ্যক হয়। এদেশ হইতে যে

তিসি ইংলণ্ডে প্রেরিত হয় তাঁহার অধিকাংশ রং ও বার্ণিস কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঐ কার্য্যে রুসিয়ার তিসি ভারতবর্ষের তিসি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এদেশের তিসিতে, বসা বা তৈলময় পদার্থের আধিক্য হেতু উহার তৈল শীঘ্র শুষ্কহয় না। দ্রব্যের গুণানুসারে তাহার ব্যবহারোপযোগিতা নিরূপিত হইয়া থাকে। কোন স্থানের আলুসিদ্ধ করিলে মমের ন্যায় আঠাল হয় এবং কোন স্থানের আলু সিদ্ধকরিলে সেরূপ হয় না। ব্রহ্মদেশে ধান্যজাতীয় ফসলপ্রচুর জন্মে। ভারতবর্ষের স্থান বিশেষে ধান্য ভাল জন্মে বটে কিন্তু ব্রহ্মদেশের ন্যায় উহার ফলন হয় না। সেখানে অল্প যত্নে বিঘাপ্রতি ৩০।৩২ মন ধান্য জন্মে এখানকার উৎকৃষ্ট জমিতে উহার অর্দ্ধেক ও জন্মেনা। ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা ও কৃষিপ্রণালীর অপকর্ষতার জন্যই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে,হিমালয়ের নিম্নদেশে শাল, শিশু ও দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ স্বভাবতঃই যথেষ্ট জন্মে, ব্রহ্মদেশে ঐ সকল বৃক্ষ অধিক জন্মেনা, কিন্তু সেগুণ যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। মৃত্তিকার স্তর বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## পশু-পালন।

কৃষি কার্য্যে ব্যবহারের জন্য আমাদিগকে কতকগুলি পশু পালন করিতে হয়। ভূমি কর্ষণ, সারবহন প্রভৃতি অনেক কার্য্যে গরু ও মহিষ আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন দেশে অশ্ব দ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ছাগ মেষাদি জন্তুগণকে কৃষিকার্য্যের আনুষঙ্গিক রূপে পালন করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল জন্তু হইতে জমির উৎকৃষ্ট সার পাওয়া যায় এবং সময়ে সময়ে মনুষ্যের আহারার্থ উহাদের মাংস প্রয়োজন হয়। অন্ন, রুটি, দাইল, তরকারি ও ফল মূলাদি জীবন ধারণের জন্য যেমন আবশ্যক, দুগ্ধ ঘৃত মৎস্য মাংস ও ডিম্বাদি ও তেমনই আবশ্যক। শরীর আচ্ছাদনের জন্য রেসম, পশম, কার্পাস প্রভৃতির ও নিতান্ত প্রয়োজন। সুতরাং মনুষ্যের আবশ্যক প্রায় সমস্ত দ্রব্যই কৃষিজাত বলা যায়।

গোজাতি এদেশের লোকের যে কত উপকারী জন্তু তাহা বলাযায় না। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ ইহা জানিয়া গাভীগণকে পূজ্য ও মাতৃতুল্য জ্ঞান করিতেন। মনুষ্য যে সকল পশু পালন করিয়া থাকে তন্মধ্যে গরু ও মহিষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গরু অপেক্ষা মহিষ কিছু বলিষ্ঠ, কিন্তু মহিষ পালনে ব্যয় কিছু

অধিক হয়। এই দুই পশুর মধ্যে কৃষিকার্য্যে গরুর ব্যবহার করাই ভাল। অধিক জঙ্গল ও যথেষ্ট পতিত জমি যে স্থানে আছে, কেবল সেইখানেই অল্পব্যয়ে মহিষ পালনকরা যায়। মহিষের দুগ্ধ অত্যন্ত গাঢ় এবং সহজে জীর্ণ হয়না। মহিষ জল বৃষ্টি বিলক্ষণ সহ্য করিতে পারে এবং অনাবৃত স্থানে অক্লেশে সকল ঋতুতেই থাকিতে পারে, গোয়াল আবশ্যক করেনা।

এদেশের কৃষকগণ অতি হীনাবস্থ, সুতরাং অন্য পশুঅপেক্ষা গরু ব্যবহার করাই তাহাদের পক্ষে অনায়াস সাধ্য। গোজাতি মনুষ্যের পরম আদরের জন্তু। অধুনা উঁহাদের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে। ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস হইয়াই হউক অথবা দেশের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই হউক পূর্ব্বের ন্যায় জমি এক্ষণে পতিত থাকে না, সুতরাং যথেষ্ট গোচারণ ভূমি নাথাকায় গবাদি পশু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পায় না। এজন্য তাহারা দিন দিন, কৃশ, দুর্ব্বল, রোগী ও খর্ব্বকায় হইতেছে, অবশেষে ঐ সকল দোষ বংশপরম্পরায় সংক্রান্ত হইয়া জাতিগত দোষে পরিণত হইতেছে। যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর আহার দ্বারা তাহাদিগকে, হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করা যাইতে পারে এবং অন্য প্রদেশের উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষ দ্বারা বৎসোৎপাদন করাইলে তাহাদের শারীরিক খর্ব্বতা ক্রমে দূর হইবে।

স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মানুসারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর আহার ও বিশুদ্ধ পানীয় এবং উপযুক্ত স্থানে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে পশুদিগের প্রায় কোন পীড়া হয় না। পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমি আবাদ করিলে তদুৎপন্ন শস্যে

একটি পরিবার সম্বৎসর প্রতিপালিত হইত এক্ষণে তাহার চতুর্গুণ ভূমি আবাদ করিয়াও ছয়মাসের আহারোপযোগী শস্য সংগ্রহ করা কঠিন হইয়াছে। যে কৃষক নিজেই উদর পুরিয়া খাইতে পায় না, সে তাহার গরু বাছুরকে কি রূপে খাওয়াইবে? কৃষকগণের অবস্থা এতই হীন হইয়াছে যে, কেবল মাত্র কৃষি-কার্য্যের জন্য যে কয়টি গরু রাখা উচিত, সে কয়টিকেও উপযুক্ত-রূপ আহার দিবার সঙ্গতি তাহাদের নাই। গো-পালন করাই এদেশের গোপদিগের উপজীবিকা, এক্ষণে তাহাদের ও দুরবস্থা দেখা যায়। পূর্ব্বে একটি গাভীতে যত দুগ্ধ দিত এক্ষণে দুই তিনটিতেও তত দুগ্ধ দেয়না। স্ব স্ব গরু গুলিকে অগ্রে সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখিবার চেষ্টা করিয়া তবে কৃষিকার্য্যে বা গো-পালনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

যে স্থানে নদীর চর নাই অথবা জমিদারগণ নিজের আয় বৃদ্ধির জন্য জমি পতিত রাখেন না, সে স্থলে কৃষকগণের স্ব স্ব জোত জমার অন্তর্গত কতক জমি গোচারণের উপযুক্ত ঘাসের জন্য সম্বৎসর পতিত রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ না করিলে অল্পাহার জন্য গোজাতির বড় দুর্দ্দশা হয়। আবাদ করিয়া ঘাস উৎপাদন করিলে একবিঘায় যে ঘাস জন্মে বিনা আবাদে তদপেক্ষা অনেক অল্প জন্মে। সকল সময়ে কাঁচা ঘাস পাওয়া যায় এমন ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়, তাহা না হইলে শুকঘাস প্রচুর দিলেও চলিতে পারে।

ঘাসের চাস করার রীতি এদেশে নাই, এজন্য স্ব স্ব জমি জমার মধ্যে কয়েক বিঘা ঘাসের জন্য রাখিয়া মধ্যে মধ্যে উহাতে সারপ্রয়োগ ও জলসিঞ্চন করিলে বারমাস কাঁচা ঘাস

পাওয়া যায়। দূর্ব্বা ও নানাজাতীয় ঘাস স্বভাবতঃই জন্মে, তাহাভিন্ন গবাদির আহারার্থ অন্য যে সকল তৃণ শস্যাদি উপাদন করা যাইতে পারে তাহা পরে বলা যাইবে।

এদেশের গোয়ালঘর নির্ম্মাণ প্রণালী অতি অপকৃষ্ট। বাসস্থানের কিছুদূরে গোয়াল করা কর্ত্তব্য, তাহাহইলে গ্রাম-অপরিষ্কার ও তথাকার বায়ু দূষিত হয় না। ক্ষেত্রের নিকট হইলে সারবহনের খরচ অল্প হয়। কীটযুক্ত অপরিষ্কার জল পশুদিগকে পান করাইলে তাহাদিগের পীড়া জন্মে, এজন্য নির্ম্মল জল দেওয়া উচিত। গোয়াল ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু-সঞ্চালনের উপায় করা হয় না, উহার মেঝে আর্দ্র ও দুর্গন্ধময় হইয়া থাকে। একটি ঘরের মধ্যে অনেক গুলি গরু রাখাহয়, কিছুকাল পরে উহারা মলমূত্র ত্যাগ করে এবং তাহার উপরেই সমস্ত রাত্রি শয়ন করিয়া থাকে, এরূপ হইলে তাহাদের স্বাস্থ্য কখন ভাল থাকিতে পারেনা।

গরুর সংখ্যা বিবেচনা করিয়া গোয়ালের আয়তন স্থির করিতে হইবে। পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা দুইচালা ঘর করা ভাল। ঐ ঘরের মেঝের মধ্যস্থান দিয়া দৈর্ঘ্য বরাবর তক্তাদ্বারা উপর ঢাকা একটি পাকা নর্দ্দমা অথবা মাটির নল রাখা কর্ত্তব্য। ঐ নলটি এরূপ ভাবে স্থাপিত হইবে যে, উহার উভয় পার্শ্বস্থ ঈষৎ ঢালু মেঝের মূত্র গড়াইয়া নলের মধ্য দিয়া ঘরের বাহিরের কোন গর্ত্তে যাইয়া পড়ে। বৃষ্টির জল না পড়িতে পারে এজন্য ঐ গর্ত্তগুলির উপরে আবরণ থাকা আবশ্যক।

একটি গর্ত্তে গোবর ও অন্য গর্ত্তে মূত্র ভূমির সারের জন্য সঞ্চিত রাখিতে হইবে এবং দুর্গন্ধ নিবারণ জন্য মধ্যে মধ্যে শুষ্ক

ও চূর্ণ মৃত্তিকা উহার উপরে ছড়াইয়া দিবে। মূত্র তরল বা থাকে এজন্য অধিক মৃত্তিকা মিশাইবে। পুরাতন দেওয়াল অথবা পুষ্করিণী ও গর্ত্তাদির শুষ্কমৃত্তিকা মিশান উচিত। যে জমিতে এই সার দিতে হইবে তাহার প্রাকৃতিক গুণ বৃদ্ধি পায় সেরূপ মৃত্তিকা হইলেই ভাল হয়। প্রত্যহ একবার করিয়া গোয়াল ঘর উত্তম রূপে পরিষ্কৃত ও ধৌত হওয়া প্রয়োজন। বাটীর অন্যান্য আবর্জ্জনা গোবরের রাশিতে নিক্ষেপ করিবে।

গোয়াল ঘরের মেঝে পাকা ও বিলাতীমাটি দ্বারা পলস্তা করিবে। গাভী, চাষের বলদ এবং বৎসগণের জন্য পৃথক ঘর বা প্রকোষ্ঠ করিতে হইবে। গোয়াল ঘরের সম্মুখে চতুর্দ্দিকে শক্ত বেড়া পরিবেষ্টিত একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ রাখা উচিত। অত্যন্ত শীত ও বৃষ্টির সময় ভিন্ন এই খোলা যায়গায় গরুগুলিকে রাখিবে এবং প্রচণ্ড রৌদ্র নিবারণ জন্য ছায়াপ্রদ বৃক্ষাদি প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ রূপে রোপণ করিবে। ছাগ মেষাদির জন্য পৃথক ঘর করিতে হইবে তাহা ছাড়া কিছু দূরে আর একটি খালিঘর রাখা কর্ত্তব্য। কোন পশু পীড়িত হইলে যে পর্য্যন্ত সে সুস্থ না হয় সেপর্য্যন্ত ঐ ঘরে তাহাকে রাখিতে হইবে। কোন পশুর সংক্রামকরোগ হইলে তাহাকে পাল হইতে তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। রুগ্ন ও সুস্থ পশুদিগকে একত্র থাকিতে ও একত্র চরিতে দেওয়া নিষিদ্ধ। কারণ গোজাতির প্রায় সমস্ত পীড়াই সংক্রামক-ধর্ম্ম বিশিষ্ট ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

বন্যার সময় এবং মাঠে ফসল থাকার সময়ে গোচারণের স্থান প্রায় থাকেনা, অতএব তৃণ শস্যাদির জন্য যে জমি পতিত রাখিবার কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে সেই জমির ঘাস পশুগণকে

খাওয়াইতে পারা যায়। কৃষকেরা গরুকে যাহা খাইতে দেয় তাহাতে পুষ্টিকর পদার্থ কিছুই থাকেনা। গোচারণ স্থানে যথেষ্ট ঘাস না থাকায় গরু গুলি অর্দ্ধাহারে গৃহে ফিরিয়া আসিলে, কেহ কেহ ২।১ আটি বিচালি দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। এইরূপ অল্পাহারে তৃপ্ত থাকিয়া উহাদিগকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয় সুতরাং তাহারা দিন দিন কৃশ ও পীড়িত হইয়া অকালে মরিয়া যায়। যে পরিমিত বলে কার্য্য করিলে সুচারুরূপে ভূমিকর্ষণ হয়, তাহার অর্দ্ধেক বল ও তাহাদের শরীরে থাকেনা, সেজন্ত চাষেও ইচ্ছানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। অজন্মার ইহা একটি প্রধান কারণ।

আহার দ্বারাই শ্রমজনিত দেহের অপচয় পূরণ হয়। শারীরিক বল আহার হইতেই উৎপন্ন হয়। শারীর যন্ত্রের বলক্ষয় হওয়াকে দৈহিক অপচয় এবং তাহা না হওয়াকে বলসঞ্চয় কহা যায়। যে পশু যেমন পরিশ্রম করিবে তাহাকে সেইরূপ আহার দিতে হইবে। গাভীগণকে ভাল রূপে আহার না দিলে তাহারা অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দেয় না। আলোক ও তাপ বলের উৎপত্তির কারণ। যে সকল উদ্ভিদ তৃণজীবী জন্তুগণের খাদ্য, রূপান্তর কালে তাহাও তাপ উৎপাদন করে। তৃণ শস্যাদি খাইয়া জীবগণ কিরূপে বলিষ্ঠ ও শ্রমক্ষম হয় তাহা ক্রমশঃ দেখান যাইবে।

দুই প্রকারে উদ্ভিদ গণকে রূপান্তরিত করাযায়। প্রথমতঃ উহাদিগকে দগ্ধ করিলে যে তাপ জন্মে তাহা কোন বাষ্পীয় যন্ত্রে প্রযুক্ত হইলে নির্দ্দিষ্ট বলে কার্য্য করে। দ্বিতীয়তঃ উহাকোন জীবের পাকস্থলীতে পরিপক্ক হইলে, শারীরিক তাপ

জন্মে এবং সেই তাপোৎপন্ন বলে, গমনাগমন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্য, শ্বাস, প্রশ্বাস প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া অবশেষে স্বেদ ও মলমূত্রাদি রূপে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। উদ্ভিদ প্রকৃতি হইতে পরমাণু সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব দেহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বল সঞ্চয় করে; কিন্তু জীবগণ স্ব স্ব পাকস্থলীতে সেই উদ্ভিদ ধ্বংশ ও বিয়োজন করত বলক্ষয় করে। এই বলক্ষয়ের ফল পরিশ্রম; অতএব শারীরিক পুষ্টি ও বলাধান প্রভৃতি সমস্তই আহারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

উপাদান অনুসারে মনুষ্য ও পশুগণের খাদ্য দ্রব্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। যদি এক খণ্ড মোটা কাপড়ের উপর কিছু ময়দা রাখিয়া হাত দিয়া জলে ধৌত করা যায় তবে দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ জল ঐ কাপড়ের নীচে পড়িবে এবং উহার উপরে কাঁঠালের আঠার ন্যায় একটি পদার্থ থাকিয়া যাইবে তাহা আর জলে ধৌত হইবে না, ইহাকে "গ্লুটিন" কহে। পূর্ব্বোক্ত জল কিছুক্ষণ স্থির ভাবে রাখিলে তাহার নীচে শ্বেতবর্ণ এক প্রকার পদার্থ সঞ্চিত হইবে, তাহাকে "শ্বেতসার" কহে। গমের উপরে যে খোসা থাকে উহা কাষ্ঠময় পদার্থ; কারণ কাষ্ঠ ও খোসার উপাদান প্রায় এক প্রকার।

অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ঐ খোসা পরীক্ষা করিলে উহা মৌচাকের ন্যায় অসংখ্য ষড়ভুজাকার কোষসমষ্টি দেখায়। এই কোষ সমূহ, বসা বা তৈলময় পদার্থে পরিপূর্ণ। গমের কেন্দ্রস্থানে বিশুদ্ধ শ্বেতসার, এবং উহার কেন্দ্র ও খোসার মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহাতে শ্বেতসার ক্রমশঃ কাষ্ঠাংশের সহিত মিশ্রিত হইয়া আসিয়া কেন্দ্র অপেক্ষা উহার খোসায় তৈলময়

পদার্থের আধিক্য দেখা যায়। গমের যে স্থান দিয়া অঙ্কুর বাহির হয়, সেই স্থানেই গ্লুটিন অধিক, তথা হইতে কেন্দ্রাভিমুখে ক্রমশঃ কমিতে কমিতে গিয়াছে। এইজন্য উৎকৃষ্ট ময়দা অপেক্ষা আটা অধিকতর পুষ্টিকর।

গম বা চাল হইতে আমরা কয়েকটি পদার্থ প্রাপ্ত হই; যথা, শ্বেতসার বা ষ্টার্চ, তৈলময় পদার্থ বা এলবুমিন্, গ্লুটিন, ও দারুময় পদার্থ। জীবনধারণের জন্য ঐ সকল যৌগিক পদার্থ বিশেষ প্রয়োজন। উহাদের মধ্যে কোন একটি দ্বারা শরীরপোষণ কার্য্য সম্যক রূপে হয় না, সকল গুলিই উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যবস্তুতে থাকা আবশ্যক। শ্বেতসার জীবের পাকস্থলীতে যাইয়া শর্করায় পরিবর্তিত হয় ও শারীরিক তাপ-সমতা রক্ষা করে। এলবুমিন ও গ্লুটিন অন্যান্য পদার্থ সংযোগে অস্থি ও মাংশপেশী গঠন করে এবং বসা বা তৈলময় পদার্থ তাপ উদ্ভাবন ও মেদ বর্দ্ধন করে। প্রাণিগণ এইরূপে স্ব স্ব দৈহিক অপচয় পূরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে।

জীব ও উদ্ভিদের শারীরিক ক্রিয়ার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। উভয়েরই জন্ম, মরণ ও জীবিতাবস্থা আছে। জীবগণ উদ্ভিদ বা অন্য কোন জীবদেহস্থ যৌগিক পদার্থ আহার করিয়া প্রাণধারণ করে, আবার যে রূঢ় পদার্থ হইতে ঐ সকল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, উদ্ভিদ গণ জল, বায়ু ও মৃত্তিকা হইতে সেই সকল পদার্থ সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব দেহ গঠন করে। উভয়েরই শারীর যন্ত্রাদি আছে উভয়েরই স্বজাতি উৎপন্ন করিবার শক্তি আছে এবং উভয়েরই দেহের কতক গুলি উপাদান এক-রূপ। জীব ও উদ্ভিদ দেহে নাইট্রোজনময় কতক গুলি সাধারণ

উপাদান আছে উহাদের সমবায়কে "প্রোটিড" কহে, ইহা একটি যৌগিক পদার্থ। উহা কেবল জীব ও উদ্ভিদ দেহে দেখা যায়, এবং উহা জলে দ্রব হইয়া জীব ও উদ্ভিদ শরীরের গঠন কার্য্য সম্পাদন করে।

বৃক্ষ পত্রাদির রস বাহির করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে উহার জলীয়াংশ হইতে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ অস্বচ্ছ পদার্থ দলা বাঁধিয়া বিচ্ছিন্ন হয়, উহাকে "উদ্ভিজ্জ এলবুমিন" কহে। ময়দা বা বেসম জলমিশ্রিত করিয়া কিছু ক্ষণ স্থিরভাবে রাখিলে উপরে যে পরিষ্কার জল জমে, তাহা অগ্নিতে ফুটাইলে ঘোলা হইয়া এক প্রকার দলা বাঁধা দ্রব্য অধঃ ক্ষিপ্ত হয় তাহাও উদ্ভিজ্জ এলবুমিন। দুগ্ধ, রক্ত ও মাংসে কিয়ৎ পরিমাণে উহা দৃষ্ট হয়। ডিম্ব মধ্যে যে শ্বেতবর্ণ তরল আঠাল পদার্থ দেখা যায় তাহাকেও এ্যালবুমিন কহে, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব এ্যালবুমেন প্রায় একই পদার্থ। ডিম্বে যে পীতাংশ আছে তাহাকে কুসুম কহে, ইহাই গ্লুটিনের সদৃশ বস্তু; অতএব শ্বেতসার, গ্লুটিন, বসা বা তৈল, এলবুমেন ও কাষ্ঠাংশ গুলি জীব ও উদ্ভিদগণের দেহপুষ্টির প্রধান উপাদান, এতদ্ব্যতীত চুণ, লৌহ, গন্ধক পটাস্, সিলিকা, ফস্ফোরস প্রভৃতি কতকগুলি খনিজ পদার্থ উহাতে বিদ্যমান আছে।

আহার্য্য বস্তু মাত্রই "নাইট্রোজনময়" ও "নাইট্রোজেন-বিহীন" এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। এ্যালবুমিন, বসা, বা তৈলময় পদার্থসমূহ প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত, মেদ মাংস, অস্থি ও মাংসপেশীর পরিপুষ্টিসাধন ইহার কার্য্য। কার্ব্বোহাইড্রেট এবং বসা বা চর্ব্বি শেষোক্ত শ্রেনীর অন্তর্গত। অঙ্গার ও হাইড্রোজেন উহাদের উপাদান। উহাদের দ্বারা শারী

রিক তাপ পরিমাণের সমতা রক্ষিত হইয়া থাকে। দ্রব্য বিশেষে ন্যূনাধিক পরিমাণে শর্করার অংশ বর্ত্তমান আছে।

শারীর যন্ত্রের অভ্যন্তরে খাদ্য বস্তুর যে সকল পরিবর্ত্তন হয় তদ্দ্বারাই শ্বেতসার বা তৈলময় পদার্থের কিয়দংশ শর্করায় পরিবর্ত্তিত হয়। শর্করা, জল ও অঙ্গার ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং আমরা অগ্নিসংযোগে অঙ্গার হইতে যেরূপ তাপ প্রাপ্ত হই সেইরূপ খাদ্য দ্রব্য হইতে দেহমধ্যে যে কার্ব্বন জন্মে, তদ্দ্বারা শারীরিক তাপ উৎপন্ন হয়।

একটি কাচের গ্লাসে অল্প জলমিশ্রিত কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত চিনি রাখিয়া তদুপরি উগ্র গন্ধকদ্রাবক ঢালিয়া দিলে অতি বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ শর্করাও তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে, ও তাহার জলীয় ভাগ পৃথক হইয়া ঐ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ জমাট বাঁধিয়া যাইবে। এস্থলে দ্রাবকের হাইড্রোজেনের সহিত জলমিশ্রিত চিনির জলীয় ভাগ রাসায়নিক বিয়োজন প্রযুক্ত পৃথক হইয়া বিশুদ্ধ অঙ্গার অবশিষ্ট রহিবে। শরীরের অভ্যন্তরস্থ পাকযন্ত্রে, তণ্ডুল, গোধূমাদির শ্বেতসার প্রথমতঃ শর্করায়, পরে তাহা হইতে অঙ্গারে পরিণত না হইলে শারীরিক তাপ জন্মিত না, সুতরাং উষ্ণশোণিত বিশিষ্ট কোন জীবই বাঁচিত না।

পশুগণের ভক্ষ্য তৃণ শস্যাদিতে "কাষ্ঠতন্তু" "শ্বেতসার" "তৈলময়পদার্থ" এবং "এ্যালবুমেন" প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। গোমেষাদির ভক্ষ্য বস্তু সমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যাহাতে আঁশ বা দারুময় অংশ ও শ্বেতসার আছে তাহাকে "কার্ব্বোহাইড্রেট্" কহে। এক ভাগ অক্সিজন, দুই ভাগ হাইড্রোজন ও ছয় ভাগ কার্ব্বন সংযোগে উহা

উৎপন্ন হয়। যাহাতে তৈল বা রজন্ আছে তাহাকে তৈলময় এবং ডিম্বের শ্বেতাংশসদৃশ পদার্থ যাহাতে আছে তাহাকে "এল্‌বুমেন ময়" কহে। এরোরুট ও ময়দাতে এবং কোন কোন মূলক জাতীয় উদ্ভিদে প্রচুর শ্বেতসার আছে।

কতকগুলি কুট্টিত তিসি বা সূক্ষ্মাকারে কর্ত্তিত শুষ্ক তৃণ কিয়ৎক্ষণ স্পিরিটে সিদ্ধ করিয়া বায়ুতে শুষ্ক করিলে, তিসি ও তৃণের তৈলময় ভাগ পৃথক হইয়া যায়। তৈলময় ভাগ জলে দ্রব হয় না, স্পিরিট, ক্লোরোফরম্ ও ইথারে দ্রবহয় এবং অগ্নির উত্তাপে গলিয়া যায়। এলবুমেন জলে দ্রবণীয়, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে কঠিন হইয়া যায়, তখন উহা জলে দ্রব হয় না। হাইড্রোজন ও অকসিজন ব্যতীত ইহাতে অল্প পরিমাণে গন্ধক ও ফস্ফরাস্ আছে। যে খাদ্য বস্তুতে নাইট্রোজন আছে, তাহা মাংসবর্দ্ধক এবং যাহাতে নাইট্রোজন নাই তাহা তাপপ্রদ ও মেদবর্দ্ধক। উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা হইতেই খাদ্যের গুণাগুণ ও তাহার পুষ্টিকারিতার উৎকর্ষাপকর্ষ সহজেই স্থির করিতে পারা যাইবে এবং তদনুসারে পশুগণের আহারের ব্যবস্থা করিলে তাহাদিগকে সবল ও স্থূলকায় রাখিতে পারা যাইবে।

পালিত পশুগণের আহারের জন্য যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে ও যাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে, সংক্ষেপে তাহাদের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। পশুদিগকে এক প্রকার খাদ্য দেওয়া ভাল নহে, মিশ্রখাদ্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। বয়স ও জাতি অনুসারে পশুগণের খাদ্যের ইতর বিশেষ করিতে হয়। ধান, গম, মটর, মসুর, কলাই ইত্যাদির ভুসী ও খড় তাহাদের প্রধান খাদ্য। সরিষা, তিসি, পোস্ত, নারিকেল প্রভৃতির খইল,

নানাবিধ মূলক জাতীয় ফসল যেমন, আলু, মূলা, গাজর, শালগম, বীট প্রভৃতি এবং লাউ, কুমড়া জাতীয় ফল, দাইলের খোসা, ময়দার চোলক, বুট, জৈ, নানা জাতীয় মটর ও অন্নমণ্ড ইত্যাদিকে উৎকৃষ্ট খাদ্য বলা যায়। উহা ব্যতীত নানাজাতীয় ঘাস ও বৃক্ষের পত্রাদি ও তাহারা খাইয়া থাকে।

এ দেশে শস্য সমূহ ক্ষেত্রে পরিপক্ক হইবার অনেক পরে কর্ত্তিত হওয়ায় উহাদের তৃণ পশ্বাদির পক্ষে অতিশয় দুষ্পাচ্য হইয়া উঠে। যদি শস্যসমূহের শীর্ষাগ্রভাগ হরিদ্রাবর্ণ হইবা মাত্র কর্ত্তিত হয় তাহা হইলে শস্য ও খড় উভয়ই ভাল হয় এবং সহজে পরিপাক হইয়া থাকে। এরূপ খড়ের মূল্য ও কিছু অধিক হওয়া উচিত। খইলের মধ্যে তিসির খইল ও তদভাবে তিসি, পশুগণের অতি পুষ্টিকর খাদ্য। যে গুলি অতি দুষ্পাচ্য বস্তু, তাহাদিগকে অতি সূক্ষ্মাকারে কাটিয়া উষ্ণজলে ২।১ ঘণ্টা ভিজাইয়া দেওয়া উচিত।

ঘাস ও বিচালি কাটিবার জন্য একরূপ যন্ত্র আছে, তদ্দ্বারা বিচালি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিতে পারাযায়। কলিকাতার হার্ট ব্রাদার্স কোম্পানি কুট্টিত জৈ, বুট, ও যন্ত্র কর্ত্তিত বিচালি সমান ভাগে মিসাইয়া এক প্রকার মিশ্রখাদ্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। অনেকেই ইহা এক্ষণে ঘোড়া ও গরুর জন্য ব্যবহার করেন। পশুদিগের পক্ষে উহা অতি উপাদেয় খাদ্য। গোচারণ ভূমি পতিত রাখিলে তাহাতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর ঘাস জন্মে না। মধ্যে মধ্যে উহাতে সারপ্রয়োগ ও জল সিঞ্চন করিলে ভাল ঘাস জন্মে। কিঞ্চিৎ যত্ন ও পরিশ্রম করিলেই বৎসরের সকল সময়ে যথেষ্ট ঘাস পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে যে কার্ব্বোহাইড্রেটের কথা বলা হইয়াছে তাহা নাইট্রোজন বিহীন, তাপপ্রদ, মেদবৰ্দ্ধক, কিন্তু মাংস বা পেশীগঠক নহে। উদ্ভিদের যে অংশে শ্বেতসার, শর্করা ও তৈলময় পদার্থ নাই তাহাই নাইট্রোজনময়। বৎস ও শাবকগণের পক্ষে নাইট্রোজনময় খাদ্য বিশেষ উপকারী, কারণ তাহাদের দেহ ক্রমশঃ বৰ্দ্ধন শীল। পূর্ণবয়স্ক পশুগণের পক্ষে অন্য প্রকারের খাদ্য আবশ্যক এবং শীর্ণকায় পশুদিগকে মাংসল করিতে হইলে ও নাইট্রোজনময় আহার অধিক করিয়া দিতে হইবে। পশুগণের বয়স, পরিশ্রম ও খাদ্যের গুণাগুণ বিবেচনা পূর্ব্বক আহারের ব্যবস্থা করা উচিত।

খইল, একসের, ছোলা বা মটরজাতীয় শস্যচূর্ণ একসের এবং প্রয়োজন মত ঘাস বা বিচালি ও কিছু আলু বা শালগম ক্ষুদ্রাকারে কাটিয়া একত্র মিশাইয়া দিলে একবারকার আহার প্রস্তুত হয়। শুষ্ক তৃণাদি যন্ত্রদ্বারা অতি সূক্ষ্মাকারে কাটিয়া গরম জলে ২।১ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। যদি পূর্ব্বোক্ত খাদ্যের সহিত পিষ্ট যব আধসের ও সিদ্ধতিসি দেড় সের মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায় তবে অল্প কালের মধ্যেই পশুগণ বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইবে। প্রতিদিন তিনবার ঐ রূপ খাওয়াইতে হইবে এবং প্রতিবারের খাদ্যের সহিত ২।১ তোলা লবণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত।

যে সকল গাভীর শৃঙ্গ নাই অথবা ছোট শৃঙ্গ আছে তাহারাই অধিক দুগ্ধ দিয়া থাকে। গাভীকে প্রচুর আহার না দিলে অধিক দুগ্ধ দেয় না। আহার ভাল হইলে দুগ্ধ পুষ্টিকর হয় অর্থাৎ সে দুগ্ধে মাখনের ভাগ অধিক থাকিবে। কোন কোন গাভীকে ভালরূপ খাওয়াইলেও দুগ্ধ অধিক দেয় না, তাহাদের

দুগ্ধনিঃ সারণ শক্তি বলবতী নহে। রেড়ি বা এরণ্ড পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে ঐসকল গাভীর স্তনে জড়াইয়া বাঁধিয়া দিয়া ২।১ ঘণ্টা রাখিবে। দিবসে ৩।৪ বার এইরূপ করিলে ৫।৬ দিনের মধ্যে তাহারা অধিক দুগ্ধ দিবে। যদি গোচারণ স্থানে পশুগণের উদর পূর্ণ হয়, তবে দিবসে একবার মাত্র পূর্ব্বোক্ত রূপ আহার দিলেই চলিবে। তাহা না হইলে প্রত্যহ ২।৩ বার ঐরূপ আহার না দিলে উহারা সবল ও পুষ্ট থাকিবে না।

যদি গাভীগণকে অধিকতর দুগ্ধবতী করিতে চাও তবে তাহাকে উষ্ণজলসিক্ত কর্ত্তিত খিচালি ৫ সের, তিসির খইল দেড় বা দুইসের, দাইলের খোসা বা ময়দার চোকল আধসের, পিষ্ট বা কুট্টিত মটর জাতীয় শস্য একসের, কপির পাতা ও আলু, শালগম প্রভৃতিতে ১০।১২ সের কিঞ্চিৎ লবণের সহিত মিশাইয়া আহার করাইবে। যখন দুগ্ধ ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে তখন মটর কড়াইয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আরও অনেক প্রকার খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে, তাহাকে যাব কহে। গাভীগণকে আহার দিতে কৃপণতা করা অবিবেচনার কার্য্য কারণ মনুষ্যের যাবতীয় উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য বস্তু দুগ্ধ হইতেই প্রস্তুত হয়।

যাঁহারা কৃষিকার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত রূপে গাভীপালন করিলে স্বক্লেশে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন। নবপ্রসূত বৎসগণকে প্রথমে সূক্ষ্ম খণ্ডে কর্ত্তিত আলু বা গাজর এবং যব বা তণ্ডুলের মণ্ডে কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া খাইতে দিবে। তাহাদের বয়স দুই মাস পূর্ণ হইলে, ঐ খাদ্যের সহিত কিছু কিছু খইল, আলু ও কোমল ঘাস দিবে। কিন্তু

স্তন্য না পাইলে উহারা সম্পূর্ণ বলিষ্ঠ ও উহাদের দেহের অস্থি-গঠন কার্য্য ভালরূপে হইবে না। গরুর ওজনের মণ করা ৫ সের এবং ছাগ মেষাদির ওজনের মণকরা ৮ সের নির্জ্জলা শুষ্ক আহার দিলে তাহাদের শরীরের ওজন ঠিক থাকিবে ও কৃশ হইবে না। তাপোৎপাদক খাদ্য অধিক দেওয়াতে কোন ফল নাই, বরং নাইট্রোজনময় পদার্থ খাওয়াইলে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট সার পাওয়া যাইবে। তাপোৎপাদক পদার্থ খাওয়াইলে তাহা হইতে ভাল সার পাওয়া যাইবে না।

প্রায় সমস্ত শৃঙ্গী জন্তুই রোমন্থক, সুতরাং তাহাদের চর্ব্বণের প্রায় বিরাম নাই। পশুগণের খাদ্য এরূপ ভাবে তৈয়ার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যেন তাহাদিগকে অধিক চর্ব্বণ করিতে না হয় এবং তাহাদের পাকযন্ত্র ও কিছু বিশ্রাম পায়। কারণ চর্ব্বণ ও পরিপাক করিতেও অনেক বলের অপচয় হয়। মেষ জাতির পক্ষে খইল বড় উপকারী পদার্থ। তাহাদিগকে ঘাস, দানা ও মূলক জাতীয় ফসল প্রচুর দেওয়া কর্ত্তব্য। যে মেষ ওজনে একমণ ত্রিশসের, তাহাকে দেড় মাস কাল কাঁচা ঘাস আধসের, তিসির খইল আধপোয়া এবং দশসের আলু গাজর বা তত্তুল্য অন্য কোন দ্রব্য খাওয়াইলে, তাহার ওজন দুইমণ হইবে এবং বিলক্ষণ মাংসল হইয়া অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে।

মেষলোমে কম্বল, ফ্লানেল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পশমী কাপড় প্রস্তুত হয়। মেষলোমে পটাস বা ক্ষার আছে। লোম হইতে পটাস পৃথক করিবার জন্য ফ্রান্সদেশে অনেক কারখানা আছে। এক মণ লোম হইতে দেড়সের পটাস পাওয়া যায়। চরিবার সময় পশুগণ যদি জমিতেই মলমূত্র ত্যাগ করে তবে যে জমিতে অনেক

দিন পর্য্যন্ত মেষ চরে, সেখানকার মৃত্তিকার পটাস অনেক কমিয়া যায়। সেই রূপ কোন জমিতে দীর্ঘকাল গোচারণ করিলে তথাকার মৃত্তিকার অস্থিজনক পদার্থ এত কমিয়া যায় যে, বিশ বৎসর পরে ঐ জমির প্রতি বিঘায় ৪।৫ মণ অস্থিচূর্ণ সার না দিলে তাহাতে আর ঘাস জন্মেনা। গোপালনের সঙ্গে সঙ্গে ছাগ মেষপালন করাও কর্ত্তব্য। ঐ সকল পশু হইতে উত্তম সার পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন মেষলোম একটি প্রধান পণ্য দ্রব্য।

সুচারুরূপে পশুপালন এক্ষণে হয় না, সুতরাং পুষ্টিকর খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য হেতু মনুষ্যের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অস্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক হইতেছে। পুষ্টিকর আহার মাত্রই আমরা পশুগণ হইতে পাইয়া থাকি। অতএব পশুপালনের দোষে আমরা প্রয়োজনমত পুষ্টিকর খাদ্য সুলভ মূল্যে পাইতে পারি না। আবার ঐ সকল দ্রব্য মহার্ঘ্য হইলে অথবা যথেষ্ট না পাওয়া গেলে উহাতে কৃত্রিমতা দোষ ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে সর্ব্বত্রই এই কৃত্রিমতা দেখা যায়। বিশুদ্ধ, ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল বা অন্যান্য উপাদেয় বস্তু এক্ষণে পাওয়া কঠিন। রীতিমত পশুপালন করিতে পারিলে ঐ রূপ প্রবঞ্চনা অনেক কমিয়া যাইবে এবং পশুপালকগণও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

পশুগণ যাহা আহার করে তাহার সারাংশ শারীরিক তাপ রক্ষা, পরিশ্রম, গমনাগমন ও শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যেই ব্যয়িত হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিয়দংশ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, কিয়দংশ শরীরে থাকিয়া উহার পুষ্টি বর্দ্ধন করে। পশুগণকে স্থূলকায় করিতে হইলে যে আহার দিতে হয়, তাহার সঙ্গে তৈলময় পদার্থ যাহাতে আছে, এমন দ্রব্য

মিশাইয়া দিলে অধিক ফলদর্শে। তিসির খইল অপেক্ষা তিসি উৎকৃষ্ট, উহার অভাবে কিছু তিসিতৈল যাবের সহিত মিশাইয়া দিলেও হইবে। গবাদির পক্ষে তিসি অতি পুষ্টিকর বস্তু এজন্য উহা তাহাদের খাদ্যরূপে ব্যবহার করা ভাল। তিন সের তিসি খইলের যে পুষ্টিকারিতা আছে, আধমণ আলু, ৫ সের জৈ অথবা ১০ সের শুষ্কঘাসের সেই পরিমাণ পুষ্টিকারিতা আছে।

শারীরিক পুষ্টির জন্য মিশ্র খাদ্য অধিক উপকারী। মধ্যে মধ্যে খাদ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এক প্রকার খাদ্য অধিক দিন খাওয়ান ভাল নহে। আবাদ করিয়া যে ঘাস জন্মে তাহা পুষ্পিত হইবার পূর্ব্বেই ছেদন করা কর্ত্তব্য। উহা উত্তমরূপে শুকাইয়া রাখিবে, জল সংস্পর্শে উহা যেন পচিয়া কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধ ও বিকৃত না হয়। যে ঘাস পাকিয়া জমিতেই শুকাইয়া যায় তাহার আঁশ এত কঠিন হয় যে, পশুগণ তাহা সহজে পরিপাক করিতে পারেনা এবং তাহার তৈলময় অংশ অদ্রবণীয় হওয়াতে শারীরিক পুষ্টি বিধানের বিশেষ সহায়তা করে না। আলু, মূলা, গাজর প্রভৃতি মূলকজাতীয় উদ্ভিদ পশুদের জন্য ব্যবহার করিলে সকল সময়েই উহা পাওয়া যাইতে পারে এবং অধিক দিন রাখিলেও পচিয়া নষ্ট হয় না। বীট, শালগম, এরোরুট প্রভৃতি ঐ জন্য চাষ করা কর্ত্তব্য। ঘাস নানাপ্রকার আছে তাহারও চাষ করা মন্দ নহে।

সরিষা, নারিকেল, ও তিল প্রভৃতির খইল, তিসি খইল অপেক্ষা নিকৃষ্ট। যে খইলের তীব্র ঘ্রাণ আছে পুরাতন হইলে তাহার তীব্রতা থাকেনা। যে গুলি সারক তাহাদের সহিত ধারক দ্রব্য মিশাইয়া দিতে হয়। যে গুলি পুষ্টিকর অথচ বিস্বাদ

তাহাদের সহিত কিছু গুড় মিশাইয়া দিলে পশুগণ ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহা খাইবে। তরাই প্রদেশে জলাশয়ের নিকটবর্ত্তীস্থানে এক প্রকার গাছ জন্মে, উহা ৫।৬ ফুট দীর্ঘ; উহার পাতা এরোরুটের পাতার ন্যায় এবং উহার মূল প্রায় একফুট দীর্ঘ, লালবর্ণ এবং কোমল। উহা ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া খাওয়াইলে গাভীগণ হৃষ্ট পুষ্ট হয়। সর্ব্বত্র উহার আবাদ করিলে চলিতে পারে। আর্দ্র মৃত্তিকায় উহা উত্তমরূপে জন্মে।

যে তৃণ শস্যাদিতে তৈলময় পদার্থ অধিক আছে তাহা খাওয়াইলে গাভীগণ অতি পুষ্টিকর দুগ্ধ দেয়। দুগ্ধ ও তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি স্তন্যপায়ী জীবমাত্রেরই পুষ্টিকর ও বলকারক। অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষা করিলে উহাকে বর্ণহীন এবং এলবুমেন, শর্করা, ও মাখন মিশ্রিত একটি তরল পদার্থ দেখায়। এই তরল পদার্থে অদৃশ্য শ্বেতবর্ণ ও সূক্ষ্ম চর্ম্মাচ্ছাদিত অসংখ্য বর্ত্তুলাকার মাখনের দানা ভাসমান থাকে। ঐ সকল শ্বেতবর্ণ দানার জন্য দুগ্ধের বর্ণ শ্বেত হইয়া থাকে। দুগ্ধ মন্থন করিলে ঐ সকল দানার আবরণ ছিন্ন হইয়া তন্মধ্যস্থ মাখন দুগ্ধের উপর ভাসিয়া উঠে। দুগ্ধের উপর সর ও এইরূপে পড়িয়া থাকে।

জল, ক্ষীরশর্করা বা লাকটিন্, এলবুমেন, কেসিন্ এবং কতকগুলি খনিজ পদার্থ দুগ্ধের উপাদান। উহা ক্ষার বা অম্ল ধর্ম্মাক্রান্ত নহে। স্তনমধ্যে অধিকক্ষণ থাকিলে উহা কিঞ্চিৎ বিকৃত হইতে পারে এজন্য দুগ্ধ সঞ্চিত হইলেই দোহন করা কর্ত্তব্য। প্রসবের পরেই গাভীগণের যে ঈষৎ পীতবর্ণ দুগ্ধ জন্মে তাহার মাদকতা গুণ আছে. এবং উহা অধিক ক্ষারযুক্ত হওয়াতে মনু-

ষ্যের পানীয় নহে কিন্তু বৎসগণের বিশেষ উপকারী। কিছু দিন পরে উহা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের পানীয় হয়। মাহিষ দুগ্ধ অতি গুরুপাক উহাতে মাখনের ভাগ অধিক আছে। মাখন প্রস্তুত অতি সাবধানে করা কর্ত্তব্য। যাহারা উহা প্রস্তুত করিবে তাহাদের শরীর ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার রাখা উচিত, এবং দুর্গন্ধময় স্থানে উহা কখন রাখিবে না। সের প্রতি অর্দ্ধ পোয়া লবণ মিশাইলে মাখন শীঘ্র পচিবে না, এবং ব্যবহারের সময় পরিষ্কার শীতলজলে ধৌত করিলে উহার লবণাক্ততা দূর হইবে।

চর্ব্বি ও মাখনের উপাদান প্রায়ই এক প্রকার, এ জন্য ব্যবসায়ীরা ঘৃত ও মাখন কৃত্রিম করিয়া থাকে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ঐ কৃত্রিমতা ধরা বড় সহজ নহে। মাখনের আপেক্ষিক ভার প্রতি সহস্রভাগের ৯১১ হইতে ৯১৯ ভাগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু চর্ব্বির আপেক্ষিক ভার প্রতি সহস্রভাগের ৯০৩ হইতে ৯০৫ ভাগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। চর্ব্বির দ্রবণবিন্দু তাপমান যন্ত্রের ১০৯ হইতে ১২০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত, কিন্তু মাখনের দ্রবণবিন্দু ৯৪ হইতে ৯৭ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অতএব কোন মাখনের আপেক্ষিক ভার, প্রতি সহস্রে ৯১১ ভাগের ন্যূন হইলেই তাহাকে কৃত্রিম বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। জাফ্‌রান দ্বারা রং করিলে মাখন অতি সুন্দর দেখায়। মাখন অপেক্ষা ঘৃতই লোকে অধিক ব্যবহার করে। গোদুগ্ধ মনুষ্যের পানার্থ ব্যবহৃত হওয়াতে গব্যঘৃত অধিক পাওয়া যায় না। মহিষ দুগ্ধ গুরুপাক বলিয়া ঘৃত ও মাখন প্রস্তুত জন্য ব্যবহৃত হয়। পরিপাক করিতে পারিলে মহিষ দুগ্ধের ন্যায় অন্য কোন দুগ্ধই তত পুষ্টিকর নহে।

---

# তৃতীয় অধ্যায়।

## জল বায়ু বিষয়ক বিবরণ।

ঋতু পরিবর্ত্তন, বৃষ্টি ও বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি কতকগুলি নৈসর্গিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখা উচিত। ঐ সকল ঘটনার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কৃষিকার্য্য করায় অনেক সুবিধা আছে। এ দেশের মৃত্তিকা স্বভাবতঃ উর্ব্বরা এজন্য সার প্রয়োগের বড় অধিক আবশ্যক করে না। মধ্যে মধ্যে যে অজন্মা হয়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা এবং যে সময়ে আবশ্যক সে সময়ে বৃষ্টি না হওয়াই তাহার কারণ। দেশের সর্ব্বত্র সমান বৃষ্টিপাত হয় না, অথবা কৃষকগণের প্রয়োজন মত বৃষ্টিপতন হয় না, অর্থাৎ যে সময়ে বৃষ্টি হইলে ফসলের উপকার হয় তাহার অনেক পূর্ব্বে বা পরে হওয়াতে ফসলের বিশেষ উপকার হয় না।

অনেক স্থান এরূপ আছে যে তথায় বৎসরের মধ্যে কেবল ২।১ বার মাত্র বৃষ্টি পতন হয়, কিন্তু সেই সকল স্থানে অধিক পরিমাণে শিশির পাত হইয়া থাকে। কখন কখন শীত বা বসন্ত ঋতুতে বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ক্ষেত্রস্থ ফসলের পক্ষে শিলাবৃষ্টি অতিশয় অনিষ্টকর সুতরাং এই সকল অনিষ্ট পরিহার করিবার উপায় আছে কিনা দেখা কর্ত্তব্য। বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে কি পরিমাণ বৃষ্টিপতন, এবং শিশির কুজ্ঝটিকা,

শিলাবৃষ্টি ও বায়ু প্রবাহাদি কিরূপ হইয়া থাকে, অতি যত্ন পূর্ব্বক সে সকল বিবরণ, কৃষিক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রাখিতে হইবে। বৃষ্টি পতন সকল স্থানে সমান রূপে হয় না। পূর্ব্বেকার কয়েক বৎসরের বিবরণ পর্য্যালোচনা করিলে পর বৎসরের বৃষ্টি ও বন্যাদির প্রকৃত কাল পূর্ব্ব হইতেই অনুমান দ্বারা একরূপ মোটামুটি স্থির করা যাইতে পারে এবং তদনুসারে বীজবপন, রোপণ ও শস্যছেদনাদি কার্য্য, সময় বিবেচনা করিয়া করিতে পারিলে বন্যা বা অল্পবৃষ্টিতে ফসলের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। বর্ষাকালের কোন সময়ে বন্যা হয় এবং কতদিন পর্য্যন্ত উহা স্থায়ী হয় ইহা বিশেষরূপে জানা আবশ্যক।

যে সকল জমি কোন জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী, বৃষ্টির অপেক্ষা না করিয়া সেই সকল জমি জলসিঞ্চন দ্বারা আবাদ ও বীজ বপনের উপযুক্ত করা যায়। এরূপ করিলে বন্যাহইতে আশু ধান্য রক্ষা করাযাইতে পারে। যে স্থানে জলাশয় নাই সে স্থানে, খাল, পুষ্করিণী বা বড় বেড় কূপ খনন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ কিছু অধিক ব্যয় হইলেও, পুনঃ পুনঃ ক্ষতি স্বীকার করা অপেক্ষা বরং এই ব্যয় স্বীকার করা উচিত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকগণ জলসিঞ্চন জন্য অনেক পরিশ্রম ও অর্থ-ব্যয় করিয়া থাকে। যে রূপ করিয়া প্রাত্যহিক বিবরণ রাখিবার কথা পরে বলা যাইবে তাহার জন্য কতকগুলি যন্ত্রের আবশ্যক হইয়া থাকে। তাপমান এবং বৃষ্টিমাপক যন্ত্র হইলেই মোটামুটি কার্য্য চলিতে পারে। ঐ সকল যন্ত্রের নির্ম্মাণ কৌশল অতি সহজ, মূল্যও অল্প এবং কিরূপে উহাদিগকে ব্যবহার করিতে হয় সকলেই তাহা অনায়াসে শিখিতে পারেন।

গ্রীষ্মকালে অধিক বৃষ্টি হয়না, বর্ষাকালই উহার প্রকৃত সময়। কখন কখন শীতকালেও বৃষ্টি হইয়া থাকে। শীতকালের বৃষ্টি রবিশস্যের উপকার করে বটে কিন্তু অধিক হইলে অনিষ্ট করে। কোন কোন নদীখাত পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে ভরাট হইয়া যাওয়াতে বার্ষিক বৃষ্টিপতনের গড় পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও বন্যা হইয়া থাকে। অতএব কৃষিকার্য্যে এ সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যে দেশে বন জঙ্গল অধিক আছে সে দেশে অধিক বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, আবার ঐ সকল বন জঙ্গল কাটিয়া ফেলিলে তথায় আর পূর্ব্বের ন্যায় বৃষ্টি হয় না।

মিসর দেশ মরুভূমি বেষ্টিত থাকায় তথাকার বায়ুর তাপ পরিমাণ অধিক; এজন্য ঐ দেশে মেঘের সঞ্চার হইলেই, বায়ু তাপে উহা বাষ্পীভূত হওয়ায় পূর্ব্বে বৃষ্টি হইত না। তথাকার নির্ব্বর্ষতা দোষ দূর করিবার নিমিত্ত মিসরের স্থানে স্থানে বন রক্ষিত ও বহুসংখ্যক বড় বড় বৃক্ষাদি রোপিত হওয়ায়, এক্ষণে তথায় প্রতি বৎসর শীতকালে বৃষ্টি হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা সছিদ্র, এজন্য উহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যত অধিক বায়ু প্রবেশ করে উহার উর্ব্বরতা ততই বাড়ে। বৃষ্টিবিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকামধ্যে বায়ু প্রবেশ করে এবং উহার ভিতর দিয়া জল যাইবার সময় পুরাতন বায়ুকে অপসারিত করিলে উপর হইতে নূতন বায়ু-প্রবেশের সুবিধা হয়। পুনঃ পুনঃ বৃষ্টি হইলে মৃত্তিকার মধ্যে পুনঃ পুনঃ বায়ু সঞ্চালিত হয়। রৌদ্রের সময় মৃত্তিকা যে তাপ শোষণ করে তাহা উহার কয়েক ইঞ্চি মাত্র নিম্নে পঁহুছে, কিন্তু ঐ উত্তপ্ত ভূমির উপর বৃষ্টি পড়িলে উপরিস্থ তাপ নিম্নে সঞ্চালিত

হইয়া থাকে। তাপ ও আলোক উদ্ভিদের জীবন স্বরূপ সুতরাং মৃত্তিকার নীচে উদ্ভিদগণ যত দুর পর্য্যন্ত মূল বিস্তার করিতে পারে, ততদুর পর্য্যন্ত বায়ু ও তাপেরসঞ্চার বৃষ্টির দ্বারা যেমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে অন্য কোন উপায়েই তেমন হয় না।

বৃষ্টিদ্বারা ভূমির উপরিস্থ দ্রবণীয় খনিজ পদার্থ সমুহ মৃত্তিকার নিম্নে সমভাবে সঞ্চারিত হয়। জমির উপরে যে বৃষ্টিপাত হয় তাহার কিয়দংশ নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয়, কিয়দংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় এবং অবশিষ্টাংশ ভূমিতে প্রবেশ করতঃ নিম্নস্থ মৃত্তিকাকে আর্দ্র রাখে। প্রখর রৌদ্রে যখন উপরের মৃত্তিকা শুষ্ক হইতে থাকে তখন তাহার নিম্নস্থ আর্দ্র মৃত্তিকা হইতে বাষ্পকণা অদৃশ্যভাবে উপরে উঠিতে থাকে। বৃষ্টিকালে যে সকল দ্রবণীয় পদার্থ নীচে পড়িয়াছিল, তাহা ঐ বাষ্পোদ্গমন কালে পুনরায় উপরে উঠিতে থাকে। এমোনিয়া, নাইট্রোজন ও কার্ব্বন প্রভৃতি যে সকল পদার্থ বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে, বৃষ্টিকালে ধৌত হইয়া ঐ সকল পদার্থ মৃত্তিকাতেই আনীত হয়। পটাস প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থকে মৃত্তিকা, এরূপ ভাবে শোষণ করে, যে জলে উহা ধৌত হইতে পারে না। মৃত্তিকায় এই গুণ না থাকিলে অধিক বৃষ্টিপতন দ্বারা সকল ভূমিই অনুর্ব্বরা হইয়া পড়িত।

জল বায়ু বিষয়ক বিবরণ কিরূপে লিখিয়া রাখিতে হইবে, কেবল কয়েক মাসের এক এক দিনের বিবরণ উদাহরণ স্বরূপ পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। যে স্থানে কৃষিকার্য্য করিতে হইবে সেই স্থানের বিবরণ রাখা প্রয়োজন। তালিকায় উপরে বৎসর ও মাসের উল্লেখ করিতে হইবে।

| তারিখ। | বৃষ্টিপতন। | তাপাংশ। | মন্তব্য। |
|---|---|---|---|
| ১২ই বৈশাখ | ১.৫ | ৮৪° | প্রথম রাত্রি মেঘাচ্ছন্ন পরে সামান্য ঝটিকাও বৃষ্টি। |
| ৬ই আষাঢ় | | ৮৬° | বায়ু সঞ্চার নাই, শেষ রাত্রে পূর্ব্বদিকে বাতাস বহিতে থাকে। |
| ২৭শে শ্রাবণ | ৩.৮ | ৮২° | রাত্রি ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অবিরত বৃষ্টি। |
| ৯ই পৌষ | | ৬৪° | প্রাতে কুজ্ঝটিকা ৮॥০ টা পর্য্যন্ত। |
| ২০শে মাঘ | | ৬২° | বৈকালে মেঘ হইয়া রাত্রি ৮ টার পর অল্পবৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও শিলাবৃষ্টি। |

মন্তব্যের স্থানে বায়ুর গতি, ও দিক নিরূপণ থাকাও প্রয়োজন। বৃষ্টিপতন সচরাচর ইঞ্চি ও ইঞ্চির দশমিকে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৩॥০ সাড়ে তিন ইঞ্চি বৃষ্টিপতন হইয়াছে বলিলে সেই স্থানে সমস্ত দিন বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যত বৃষ্টি পড়িয়াছে তাহা গড়াইয়া অথবা শুষিয়া নাগেলে এবং ভূমি সমতল হইলে তাহার উপর ৩॥ ইঞ্চি গভীর হইয়া জল জমিয়া থাকিত ইহাই বুঝিতে হইবে।

উপরে যেরূপ উদাহরণ দেওয়া হইল, সেইরূপ প্রতি মাসের প্রাত্যহিক বিবরণ ধারাবাহিক রূপে রাখিয়া, মাসের শেষে তাহার গড় করিয়া লইতে হইবে। মাসের সকল দিনে বৃষ্টি হয় না, যে দিন বৃষ্টি না হইবে সে দিন বৃষ্টির ঘরে শূন্য দিতে হইবে।

মাসের বৃষ্টি পতনের সংখ্যাগুলির সমষ্টিকে ঐ মাসের দিন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলেই দৈনিক বৃষ্টিপতনের গড় পাওয়া যাইবে। বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে কৃষিকার্য্যের জন্য জলের আবশ্যক হইলে কোন জলাশয় হইতে জমীতে জলসিঞ্চন করিতে হইবে। এক্ষণে জল তোলার নানা প্রকার সুলভ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা করা উচিত। উচ্চ শ্রেণীর কৃষকগণ চেষ্টা করিলে অনায়াসে যন্ত্রাদির প্রচলন করিতে পারেন এবং যন্ত্রের প্রচলন হইলে কৃসিজীবী ভদ্রলোকদিগের কৃষিকার্য্যে অনেক সুবিধা হইবে।

---

# চতুর্থ অধ্যায়।

## বীজ, অঙ্কুরোৎপত্তি ও শস্যাদির বিষয়।

গোধূম, তণ্ডুল, দাইল, আলু প্রভৃতি মনুষ্যের প্রধান খাদ্য। নানাবিধ ঘাস, মূলকজাতীয় ফসল ও শস্যাদি পশুগণের খাদ্য। কতক গুলি সাধারণ লক্ষণানুসারে উদ্ভিদ মাত্রেরই শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে। ধান্য, গোধূম, যব, ভূট্টা প্রভৃতিকে ধান্যজাতীয় শস্য কহে, কারণ উহাদের কতক গুলি সাধারণ লক্ষণ একই প্রকার। মটর, মসুর, মুগ, কড়াই, অরহর প্রভৃতিকে শিম্বধারী বা শিম্বীজাতীয় শস্য কহা যায়, কারণ উহাদের সকল গুলির শুঁটি ধরে ইহাই তাহাদের একটি সাধারণ লক্ষণ। গোলআলু

মূলা, নানাবিধ আলু, ওলকপি, বীট, গাজর, সালগম, মানকচু, ওল প্রভৃতিকে মূলকজাতীয় ফসল বলা যায়; সেইরূপ আদা, ও হরিদ্রা এক শ্রেণীভুক্ত। শাক, কপি, বেগুন, পটোল প্রভৃতিকে হরিৎফসল কহে, কারণ না পাকিতে কাঁচা অবস্থায় উহাদিগকে তরকারির জন্য ব্যবহার করা যায়। ল্যাউ, কুমড়া, শসা, ফুটী, ও তরমুজ প্রভৃতি আর এক শ্রেণীর অন্তর্গত এবং যে সকল শস্য হইতে তৈল বাহির হয় উহারাও একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্গত।

বীজ হইতে গাছ জন্মে, এবং যে সকল গাছের বীজ হয় না তাহাদের মূল বা কলম হইতে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইক্ষু ও বাঁশের কলম হইতে গাছ জন্মে। জল বায়ুর প্রকৃতি অনুসারে দেশ বিশেষে কোন কোন বীজ সম্যক রূপে পরিপক্ক হয় না, সুতরাং তাহা হইতে সতেজ চারা জন্মেনা, অথবা অধিকাংশ বীজই অঙ্কুরিত হয় না। বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে নীলের বীজ ভাল হয়। বঙ্গীয় নীলকরগণ তথা হইতে বীজ আনাইয়া থাকেন। শীতপ্রধান দেশে কপির বীজ যেমন ভাল হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সেরূপ হয় না। এতদ্ব্যতীত দেশের শীতাতপের ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত বীজ সকল কোন কোন স্থানে ভাল রূপে অঙ্কুরিত হয় এবং কোন কোন স্থানে হয় না। এদেশে যত্ন পূর্ব্বক বীজ উৎপাদন করা প্রায়ই হয় না। বীজ ভাল না হইলে চারা গুলি যে সতেজ হয় না, ইহা কৃষকগণ বিবেচনা করে না, জমীতে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহারই কিয়দংশ বীজ রাখে।

বীজ প্রস্তুত করিতে হইলে তজ্জন্য স্বতন্ত্র জমি নির্দ্দিষ্ট রাখা উচিত এবং সে জমীতে উত্তমরূপে আবাদ ও সার প্রয়োগ করিতে

হইবে নতুবা উৎকৃষ্ট বীজ পাওয়া যাইবে না। রাখিবার দোষে ও বীজ নষ্ট হইতে পারে। যে সকল বীজ বিদেশ হইতে আনীত হয় সে গুলি হইতে ২।৪ বৎসর পর্য্যন্ত সতেজ চারা জন্মে, পরে আর সেরূপ জন্মেনা, তখন আবার নূতন বীজ আনাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। আলু, ইক্ষু ও কার্পাস প্রভৃতি কতক গুলি উদ্ভিদের বীজ ২।৪ বৎসর অন্তর পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। ইক্ষুর অগ্রভাগ কাটিয়া কলমের ন্যায় রোপণ করিলে তাহা হইতে গাছ জন্মে সেই কলমকেই কৃষকেরা বীজ কহিয়া থাকে। মাঠে ফসল পাকিতে আরম্ভ হইবামাত্র তাহা কাটিয়া লইতে হইবে, কিন্তু বীজ রাখিতে হইলে গাছগুলি সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেলে তবে কাটা উচিত।

উপযুক্ত পরিমাণে তাপ ও আর্দ্রত্ব থাকিতে থাকিতে ভূমিতে বীজ বপন করিলে উহা অঙ্কুরিত হইয়া একাংশ মৃত্তিকার নীচে প্রবেশ করে ও অপরাংশ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠে। পূর্ব্বোক্ত অংশকে মূল বা শিকড় কহে, এবং শেষোক্ত অংশ হইতে বৃক্ষ জন্মে। যে পর্য্যন্ত পত্র বহির্গত না হয়, এবং মূল মৃত্তিকার মধ্যে ভালরূপে প্রবেশ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত অঙ্কুরগুলি জল ও বায়ু হইতে বাষ্প শোষণ করিয়া এবং বীজ মধ্যস্থ শ্বেতসার ও গ্লুটেনকে তরল করিয়া তদ্দ্বারা পুষ্ট ও জীবিত থাকে। বীজে শ্বেতসার ও গ্লুটেন যে অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, সে অবস্থায় উহারা জলে গলেনা সুতরাং তদ্দ্বারা উদ্ভিদের পোষণ কার্য্য চলেনা। এই জন্য অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বেই বীজ মধ্যে এক প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া উক্ত দুইটী পদার্থ জলে দ্রবণীয় না হইলে, বীজ সকল ব্যর্থ অথবা অঙ্কুরেই

বিনষ্ট হইত। প্রকৃতির কেমন আশ্চর্য্য নিয়ম যে, অঙ্কুর জন্মিবার সময় উহার মূলদেশে এক প্রকার শ্বেতবর্ণের পদার্থ জন্মে; শ্বেতসার ও গ্লুটেনকে জলে দ্রব করিবার উহার অসাধারণ শক্তি আছে।

শ্বেতসার যখন ঐ রূপে দ্রব হইয়া রূপান্তরিত হয় তখন উহাকে "ডেক্‌ষ্ট্রিন" কহে। ইহাই উদ্ভিদ নির্যাসের একটি প্রধান উপাদান। তৈলদ বীজে শ্বেতসার নাই কিন্তু উহার তৈল, শ্বেতসারের কার্য্য করিয়া থাকে। পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে তৈলদ বীজের তৈলময়পদার্থ, বায়ুর অম্লজান সংযোগে শর্করা এবং ডেক্‌ষ্ট্রিনে পরিণত হয়। যে পর্য্যন্ত অঙ্কুরটি শ্বেতবর্ণ থাকে এবং উহাতে মৃত্তিকা হইতে রসের সঞ্চার আরম্ভ হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ রসে মধুরাস্বাদন অনুভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ডেক্‌ষ্ট্রিন শর্করায় পরিণত হইতে থাকে। যখন অঙ্কুরটি হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন আবার ঐ শর্করাই কাষ্ঠতন্তুতে পরিণত হইতে থাকে। বীজ মধ্যে যে পরিমাণ শ্বেতসার ও গ্লুটেন থাকে, তাহা অল্পকালমধ্যেই অঙ্কুরের বর্দ্ধন ও পরিপুষ্টি সম্পন্ন করিয়া নিঃশেষিত হইলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগুলি তখন স্বয়ং পত্র ও কাণ্ড দ্বারা বায়ু হইতে স্ব স্ব দেহ নির্ম্মাণোপযোগী পদার্থ সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

উদ্ভিদ-নির্যাসের শর্করা পরিবর্ত্তিত হইয়া কাষ্ঠের উপাদান ও আঁশ ইত্যাদি নির্ম্মিত হইতে থাকে। প্রায় সকল উদ্ভিদেই এইরূপ পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। বৃক্ষাদির যে স্থান দিয়া রস সঞ্চারিত হয় সেই স্থানেই শর্করা বা মিষ্টতা অধিক; উহার মূল হইতে ঊর্দ্ধদিকে ক্রমশঃ শর্করা হ্রাস হইয়া গিয়া অবশেষে পত্রও

পল্লবাগ্রভাগে উহা কিছুই থাকে না। ইক্ষুদণ্ড গোঁড়ার দিকে যত মিষ্ট উপরের দিকে তত নহে। ধান্য গোধুমাদির শীষ জন্মাইবার কিছুদিন পরে উহাদের মধ্যে দুগ্ধবৎ যে এক প্রকার তরল পদার্থ দেখা যায় প্রথমে তাহাতে অধিক শর্করা থাকে, পরে শস্যের দানা বাঁধিবার সময় ঐ মিষ্টতা থাকে না। দানাগুলি পুষ্ট হইলে তাহাদের শর্করা শ্বেতসারে পরিণত হয় এবং ঐ শস্য যখন আবার অঙ্কুরিত হয়, তখন সেই শ্বেতসার শর্করায় পরিবর্ত্তিত হইয়া অঙ্কুরগুলিকে পোষণ করে।

ফল পাকিবার সময়েও সেইরূপ পরিবর্ত্তনপরম্পরা লক্ষিত হয়। ফলগুলি প্রথমে স্বাদবিহীন বা কষায়, পরে অম্ল ও অবশেষে মধুর হইতে দেখা যায়। এস্থলে ফলের অম্লতা শর্করায় পরিবর্ত্তিত হয় অথবা উহার অন্য কোন উপাদান শর্করায় পরিবর্ত্তিত হইয়া উহার অম্লতাকে গুপ্ত রাখে।

অঙ্কুরোৎপাদনার্থ আলোকের বিশেষ প্রয়োজন। সূর্য্যালোক অঙ্কুরোৎপত্তির প্রধান সহায়, চন্দ্রালোক সে বিষয়ে বিশেষ অনুকূল নহে। আলোকের ন্যায় তাপও তজ্জন্য বিশেষ প্রয়োজন, যে হেতু ৩৭° তাপাংশের ন্যূন ও ১২৮° তাপাংশের অধিক, তাপে বীজ আদৌ অঙ্কুরিত হয় না। অত্যল্প তাপাংশে বীজের জীবনীশক্তি নষ্ট হয় না, কিন্তু ১৬৮° তাপাংশে উহা নষ্ট হয়। ৬৮° হইতে ৮৬° তাপাংশে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহা হইতে সতেজ চারা জন্মে। মৃত্তিকা আর্দ্র থাকিতে থাকিতে বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। কোন কোন বীজ কর্দ্দমের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহাতেও চারা জন্মে। নদীর চরে নীল, মুগ, কড়াই, মটর ইত্যাদির বীজ এইরূপে উপ্ত হইয়া থাকে। উপ্ত হইলে সকল

প্রকার বীজ সমান পরিমাণে জল বা বাষ্পশোষণ করে না। ধান্য-জাতীয় বীজ উহার ওজনের অর্দ্ধেক, শিম্বীজাতীয় বীজ এবং ঘাসের বীজ, তাহাদের ওজনের সমান ও তৈলদ বীজ তাহার ওজনের ৮৷১০ ভাগের এক ভাগ মাত্র জলশোষণ করিয়া এত স্ফীত হইয়া উঠে যে, উহাদের আবরণ বিদীর্ণ হইয়া যায়।

এমোনিয়া, পটাস, সোডা ও কর্পূর প্রভৃতি জলে গুলিয়া তাহাতে বীজ ভিজাইয়া রাখিলে উহা অতি শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। কর্পূরের অসাধারণ অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি আছে। কর্পূর জলে গলেনা, স্পিরিট সংযোগে গলাইয়া পরে জল মিশাইতে হয়। মৃত্তিকা এবং জল বায়ুর অবস্থা বিবেচনা করিয়া মৃত্তিকার কত নীচে বীজবপন করিতে হইবে তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। সচরাচর মৃত্তিকার ২।৩ ইঞ্চি নীচে বীজ বপন করিতে হয়। মৃত্তিকার এক ফুট নীচে বীজ বপন করিলে উহা মরিয়া যাইতে পারে, সুতরাং তাহাতে চারা জন্মে না। অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তিকেই বীজের জীবনীশক্তি কহে।

জীবগণ যেরূপে জন্মে, সপুষ্পক উদ্ভিদের বীজও প্রায় সেই রূপেই জন্মে। সম্বন্ধের নৈকট্য আছে এরূপ একজাতীয় দুই প্রকার উদ্ভিদ হইতে সঙ্কর বীজ উৎপাদন করা যায়। এই বীজোৎপন্ন উদ্ভিদে জনক ও জননী-উদ্ভিদের গুণ সমূহ বর্ত্তিয়া থাকে এবং সেই সকল গুণের উৎকর্ষ জন্মে। চীনদেশীয় চা ও ভারতবর্ষীয় চা গাছ হইতে যে সঙ্কর বীজ উৎপাদন করা হইয়া থাকে তাহা হইতে যে চারা জন্মে তাহার চা পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকারের চা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হইতে দেখা যায় এবং উহার মূল্য অধিক হইয়া থাকে। এজন্য ভারতবর্ষীয়

চা-করগণ দ্বিজাত বীজ অধিক পছন্দ করেন। এই দ্বৈজাত্য জীব ও উদ্ভিদ উভয়ের মধ্যেই সংঘটিত হইতে পারে। মালিগণ জোড়কলম দ্বারা আম্র, লিচু, লেবু, কুল এবং গোলাপ প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও ফুলের কত উৎকর্ষসাধন করিয়াছে।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উপযুক্তরূপ সার প্রয়োগদ্বারা যে শস্য উৎপন্ন করা হয়, বিনা-সারে উৎপাদিত শস্য অপেক্ষা তাহার গুণের কিছু ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। উপাদানের তারতম্য প্রযুক্ত যেমন শস্যাদির ভাল মন্দ হইয়া থাকে, সেইরূপ কোন গাভীকে কেবলমাত্র শুষ্ক তৃণ খাওয়াইলে, সে যে দুগ্ধ দেয় তাহাতে পুষ্টিকর পদার্থ অত্যল্প থাকে। কিন্তু যে গাভীকে, ঘাস, দানা, তিসীর খইল গমের ভূসী প্রভৃতি তেজস্কর আহার দেওয়া যায় তাহার দুগ্ধ, অতিশয় পুষ্টিকর ও সুস্বাদ হয় এবং তাহাতে খনিজ উপাদান ও নবনীত অধিক মাত্রায় থাকে। ছাগ, মেষাদিকে ঘাস, দানা, খইল প্রভৃতি খাওয়াইয়া হৃষ্টপুষ্ট করিলে তাহাদের মাংস অধিক পুষ্টিকর ও সুস্বাদ হইয়া থাকে। আমরা শস্যাদি উৎপাদন করাকেই কৃষিকার্য্য বলিয়া থাকি কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে পশু-পালনকেও কৃষিকার্য্য মধ্যে গণ্য করিয়াথাকে, কারণ শাক সবজী যেমন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের খাদ্য, মাংসাদি সেইরূপ শীতপ্রধান দেশের খাদ্য।

খাদ্য দ্রব্য ও শস্যাদির পুষ্টিকারিতাগুণের পরীক্ষা পূর্ব্বক তাহাদের মূল্য স্থির করা উচিত। কেবল আকার বা পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া দ্রব্যাদির মূল্য স্থির করা উচিত নহে। এক জাতীয় নানা-বিধ শস্যের মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থ যাহাতে অধিক আছে তাহারই

মূল্য অধিক হওয়া উচিত। স্থান বিশেষে কোন কোন দ্রব্য ভাল জন্মিয়া থাকে এজন্য উহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

শিল্প কৃষিকার্য্যের একটি অঙ্গ ; কারণ কৃষিজাত দ্রব্য ব্যবহার-যোগ্য করিবার জন্য শিল্পের সহায়তা আবশ্যক। নীল, চা, রেসম, চিনি, তূলা প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীয় কৃষি মধ্যে গণ্য। সরিষা, তিসী, নারিকেল, এরণ্ড প্রভৃতির বীজ হইতে তৈল বাহির করা এবং তাহাকে পরিস্কার করাও এক প্রকার শিল্পকার্য্য। শস্যছেদনও গাছ হইতে উহা পৃথককরণ ইত্যাদি অনেক কার্য্য যন্ত্রাদির দ্বারা সম্পন্ন করা যায়। যে সকল ফল, মূল, শাকসবজী মনুষ্যের ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত হয় তাহাকে হরিৎফসল বলে। এরোরুটের চাষ করাও লাভজনক কৃষিকার্য্য মধ্যে গণ্য।

মেহগি, শিশু, সেগুণ, শাল, কাঁঠাল, জাম, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে মূল্যবান কাষ্ঠ পাওয়া যায় অতএব ঐ সকল বৃক্ষ রোপণ করা কর্ত্তব্য। বৃক্ষাদি রোপণ করিলে ভূমি উর্ব্বরা হয়। যে জমি নিস্তেজ হইয়া কোন ফসল ভালরূপ জন্মে না তাহাতে ঐ সকল বৃক্ষ রোপণ করিলে কিছু কাল পরে উহা উর্ব্বরা হইতে পারে, কারণ বৃক্ষাদি মূল দ্বারা মৃত্তিকার নিম্নস্থ খনিজ পদার্থ এবং পত্রদ্বারা বায়ু হইতে যে সকল পদার্থ শোষণ করে ঐ উভয় পদার্থ পত্র-পতন দ্বারা মৃত্তিকার উপরে সঞ্চিত হয়। এই রূপে অনুর্ব্বরা জমীও কিছুদিন পরে উর্ব্বরা হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে, জঙ্গল বা বাগানের বৃক্ষাদি কাটিয়া আবাদ-যোগ্য করিলে প্রথমতঃ উহা অতিশয় উর্ব্বর হইয়া থাকে। জমীতে কয়েক বৎসর ঘাস জন্মাইলেও উহা উর্ব্বরা হয়।

নানবিধ ফল ও ফুলের বাগান তৈয়ার করাও কৃষিকার্য্যের

মধ্যে গণ্য। পাট, শণ, তিসি, নারিকেল প্রভৃতি হইতে ব্যবহার-যোগ্য আঁশ পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইতেছে তৎ-সঙ্গে ঐ সকল পদার্থের আদর ও কাটতি বাড়িতেছে। উহা ভিন্ন এদেশে বনে জঙ্গলে কত প্রকার আঁশ বিশিষ্ট উদ্ভিদ স্বভা-বতঃ জন্মিয়া থাকে, সহজ উপায়ে ঐ সকল গাছ হইতে আঁশ বাহির ও উহাকে শুভ্র ও পরিষ্কার করিবার কৌশল উদ্ভাবিত হইলে তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে। কাগজের কল, পাটের কল, নারিকেলের ছোবড়ার কারখানা জাহাজের পাইল ও ছালটি কাপড় প্রভৃতির জন্য পূর্ব্বোক্ত আঁশ সকল আবশ্যক হয় সুতরাং অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

এক জনের দ্বারা সকল কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না বলিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে সমাজে শ্রমবিভাগ-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কর্ম্মকার লৌহের কার্য্য ও কৃষিযন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করে, গোপ জাতি গাভী পালন করে এবং দুগ্ধ ও তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে। তন্তুবায় কার্পাস হইতে সূত্র প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ণ করে। মোদকগণ ইক্ষু ও খেজুর গুড় হইতে চিনি, মিছরি ও নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে। চা-কর ও নীল-কর গণ নীল ও চা প্রস্তুত করে। সেইরূপ এ দেশে আর এক শ্রেণীর লোকের আবশ্যক, তাঁহারা কেবল নানাবিধ সার প্রস্তুত করিয়া কৃষকগণকে বিক্রয় করিতে পারেন এবং কোন্ জমীতে কোন্ সার উপযুক্ত, কৃষকদিগকে সে পরামর্শ দিতে সমর্থ হন। যাঁহারা রসায়ন বিজ্ঞান উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে দেশের এই অভাব দূর করিতে পারেন। এই উপায়ে দেশের উপকার ও অর্থোপার্জ্জন উভয়ই হইতে পারে।

সারের যাবতীয় উপকরণ দেশমধ্যেই যথেষ্ট পাওয়া যায়; কেবল উহা সংগ্রহ ও ব্যবহারোপযুক্ত করিয়া বিক্রয় করিলে কৃষকগণ লইতে পারে। যদি কৃষকগণ জমি বা ফসল সংক্রান্ত কোন উপদেশ চাহে, তবে তাহাও সারপ্রস্তুতকারিগণ তাহাদিগের নিকট উপযুক্ত পারিশ্রমিক লইয়া অনায়াসে দিতে পারেন। ঐরূপ আর এক শ্রেণীর লোক ও আবশ্যক হইতে পারে, তাহারা পাশ্চাত্য সভ্যদেশ সমূহের প্রচলিত উৎকৃষ্ট কৃষিযন্ত্রাদির অনুকরণে দেশের মৃত্তিকা ও পশুদিগের বলের উপযুক্ত করিয়া যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করেন। যদি দেশ মধ্যে কৃষিকার্য্য এই রূপ সুনিয়মে পরিচালিত হয় তবে অন্নকষ্ট অধিক হয় না অথচ কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হওয়াতে অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক যথেষ্ট কার্য্য পাইতে পারেন। এ দেশে কৃষিকার্য্যের ন্যায় জীবিকানির্ব্বাহের, সহজ উপায় আর কিছুই নাই এবং উহা সকলেরই অনায়াসসাধ্য, জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া যদি সকলে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করেন তবে তাঁহারা দেশের প্রকৃত হিতৈষী ও প্রশংসনীয় হইয়া অক্লেশে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন।

# পঞ্চম অধ্যায়।

## জমির সার।

এক খণ্ড ভূমিতে দীর্ঘকাল শস্যাদি জন্মিলে সে ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতার হ্রাস হইয়া থাকে, কারণ ফসলসমূহ মৃত্তিকা হইতে যে সকল পদার্থ আকর্ষণ করে তাহার কিছুই মৃত্তিকাতে ফিরিয়া আইসে না। কিছু কাল এইরূপ হইলে অবশেষে সে ভূমিতে আর ভালরূপ ফসল জন্মে না। যে ভূমির উপর বন জঙ্গল জন্মে তাহার উর্ব্বরতা হ্রাস হয় না; কারণ বৃক্ষাদি মূল দ্বারা মৃত্তিকা হইতে যাহা শোষণ করে তাহার অধিকাংশ পত্রাদিতে বর্ত্তমান থাকে, এবং সেই সকল পত্রাদি কাল ক্রমে ভূতলে পড়িয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। কিন্তু কৃষিকার্য্যে এরূপ ঘটেনা, কারণ চাষের উৎপন্ন দ্রব্য দেশদেশান্তরে প্রেরিত হয় ও দেশমধ্যেও কিয়দংশ ব্যবহৃত হয়। মৃত্তিকার এই অভাব পূরণার্থ সার প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে। গো, মেষ, অশ্ব, ছাগ, মহিষ প্রভৃতি পশুর মল মূত্র সারের জন্য ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল জন্তুকে ভালরূপ আহার দিলে উৎকৃষ্ট সার পাওয়া যায়। পূর্ব্ব-অধ্যায়ে পশুদিগের আহারের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে।

পশুগণের জাতি ও বয়স অনুসারে সারের গুণের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। যুবা অপেক্ষা বৃদ্ধ পশুর সার অধিক তেজস্কর। এ দেশের ভূমি অতি উর্ব্বরা, সার প্রায় ব্যবহার করিতে হয় না,

তথাপি অধিক ফসল জন্মাইতে হইলে সার প্রস্তুত ও রক্ষা করা এবং কিরূপে কোন্ জমিতে উহা প্রয়োগ করিতে হয় ইত্যাদি, বিষয় জানা দরকার। এক জমিতে ক্রমাগত কিছুকাল ফসল উৎপাদন করিলে উহার পটাস, নাইট্রোজন এবং ফস্ফরাস নামক তিনটী প্রধান পদার্থ কমিয়া যায়। যে সারে ঐ তিনটি পদার্থই আছে তাহাকে "সাধারণ সার" এবং যে সারে উহার দুই একটি মাত্র আছে তাহাকে "বিশেষ সার" বলে।

সার সচরাচর তিন প্রকার, জান্তব, উদ্ভিজ্জ ও খনিজ। জীবশরীর হইতে যে সার পাওয়া যায় তাহাকে "জান্তব সার" কহে। যথা, অস্থি, বিষ্ঠা ও মূত্র। গাছ পালা পচিয়া যে সার জন্মে তাহাকে "উদ্ভিজ্জ সার" এবং লবণ, সোরা, চূণ, ম্যাগ্নেষিয়া প্রভৃতিকে "খনিজ সার" কহে। খাদ্য দ্রব্যের ন্যায় সারও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে যথা, "নাইট্রোজনময়" ও "নাইট্রোজনবিহীন"। সকল সারই কিছুদিন মৃত্তিকা সংলগ্ন থাকিলে পচিয়া মাটি হইয়া যায়। বৃষ্টির জলে সারের নাইট্রোজন ধৌত হইয়া যায়। আটাল অপেক্ষা বেলে মৃত্তিকাতে বৃষ্টি দ্বারা নাইট্রোজনের অপচয় অধিক হইয়া থাকে। বৃষ্টির সময় বায়ু হইতে নাইট্রোজন ধৌত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। আকাশে বিদ্যুৎ-প্রবাহ অধিক হইলে বায়ুতে নাইট্রোজন জন্মে। অতএব বৃষ্টি দ্বারা যেমন নাইট্রোজনের কিয়দংশ ধৌত হইয়া যায়, তেমনই আবার বায়ু হইতে কিয়ৎ পরিমাণে উহা ভূতলে আনীত হওয়াতে উহার অপচয় অধিক হইতে পারে না।

এদেশের কৃষকগণ পরিশ্রম ও যত্ন পূর্ব্বক সার প্রস্তুত বা রক্ষা করিবার চেষ্টা করে না। নানাবিধ সার প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া অনেকে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এ বিষয়ে জমিদারগণের উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করা কর্ত্তব্য। নিঃস্ব কৃষকগণ বিনা সাহায্যে ঐ রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। জমিতে প্রজার দখলিস্বত্ব না জন্মিলে তাহারা উহার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হয় না। জমিদার স্বয়ংও তাহার কোন উপায় করেন না। ভূমি উর্ব্বরা হইলে জমিদারের লাভ আছে, অতএব প্রজাগণের জমির স্বত্ব অব্যাহত রাখা জমিদারের কর্ত্তব্য। প্রজাগণ জমিদারের অধীনে থাকিয়া কোন রূপে উৎপীড়িত না হয় সে বিষয়ে তাঁহাদের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত।

জান্তব সার। অশ্ব, গো, মেষ, মহিষ ও ছাগ প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুর বিষ্ঠা, মূত্র সচরাচর সারের জন্য ব্যবহৃত হয়। মৃত্তিকার উর্ব্বরতা সম্পাদক সকল পদার্থই উহাতে আছে। মল, মূত্র পৃথক পৃথক স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। গোবরের সহিত পরিত্যক্ত তৃণাদি মিশ্রিত হইলে সারের তেজ অধিক হয়। বাটীর আবর্জ্জনা ও ভস্মাদি সারের রাশিতে নিক্ষেপ করা ভাল। টাট্‌কা সার জমি আবাদের অনেক পূর্ব্বে প্রয়োগ করিতে হয়। সার অধিক দিন রাখিতে হইলে গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে, বৃষ্টির জল প্রবেশ না করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। জল পড়িলে সারের প্রধান বস্তু নাইট্রোজন ধুইয়া যায়। গোবর অপেক্ষা অশ্বমল অধিক তেজস্কর এবং উহাতে জলীয় ভাগ অল্প আছে। গোবর অপেক্ষা অশ্বমল শীঘ্রই পচিয়া মাটি হইয়া

যায় এজন্য উহাকে "উষ্ণসার" কহে এবং গোবর ধীরে ধীরে পচে বলিয়া তাহাকে "শীতল সার" কহে। গোবর অপেক্ষা মূত্র অধিক সারবান। ছাগ মেষাদির মলও অশ্ব মলের তুল্য হইয়া থাকে। মল অপেক্ষা মূত্রেই এমোনিয়া ও নাইট্রোজন অধিক পরিমাণে আছে এজন্য পশু মাত্রেরই মূত্র উৎকৃষ্ট সার।

মল ও মূত্রে পটাস, নাইট্রোজন, ফস্ফরিক এসিড, এমোনিয়া প্রভৃতি পদার্থসমূহ আছে। শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুভেদে, পশুগণের জাতি ও বয়স, এবং তাহাদিগকে খাওয়ানর রীতি অনুসারে, সারের অন্তর্গত উল্লিখিত পদার্থসমূহের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। গো, অশ্ব ও মেষ, এক বৎসরে প্রত্যেকে যথাক্রমে ২৫০ মণ, ১৫০ মণ মলত্যাগ করে এবং ঐ কালের মধ্যে প্রত্যেকে ১০০ মণ, ৩৭ মণ ও ৫ মণ মূত্রত্যাগ করিয়া থাকে। যে সারে এমোনিয়া ও নাইট্রোজন অধিক তাহার মূল্যও অধিক হইতে পারে। অশ্বের ও মেষের মূত্র অধিক ক্ষারযুক্ত এবং উহাতে "হিপুরিক" নামক এক প্রকার এসিড আছে; কিন্তু শূকর-মূত্রে উহার পরিবর্ত্তে "ইউরিয়া" নামক একটি পদার্থ অধিক আছে।

গো ও অশ্বের টাট্‌কা মলের শতকরা ৭০ ভাগ জল ও ৩০ ভাগ জৈব ও অন্যান্য পদার্থ আছে। ঐ ৩০ ভাগের অধিকাংশই জলে গলে না, কিন্তু উহা পচিলে তাহার কিয়দংশ জলে গলে. তখন জমিতে দেওয়া উচিত। এই সময়ে উদ্ভিদগণ মূলদ্বারা উহার দ্রবণীয় ভাগ আকর্ষণ করিতে পারে। নূতন সারের কেবল পটাস ভাগ জলে গলে, এমোনিয়া ও ফস্ফরিক এসিড জলে গলে না, সার পচিলে তবে উহার নাইট্রোজন প্রভৃতি পদার্থ জলে দ্রবণীয় হয়। নূতন সার ২১২ তাপাংশে শুষ্ক হইলে তাহার যে ওজন

হয় উহার শতকরা ৭।৮ ভাগ দ্রবণীয় জৈব পদার্থ থাকে কিন্তু পচিলে উহা ১৩ হইতে ১৬ ভাগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং ৫।৬ ভাগ দ্রবণীয় খনিজ পদার্থ জন্মে। সার রাশীকৃত থাকার সময়ে উহাতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। পচনকালে সারের দ্রবণীয় জৈব ও খনিজ পদার্থের আধিক্য হয়, উহাতে যে যে জৈব এসিড পূর্ব্বে ছিলনা বা অল্পমাত্রায় ছিল, তদন্তর্গত নাই-ট্রোজনবিহীন জৈব-উপাদান ও মিশ্রিত তৃণাদির পচনকালে সেই সকল এসিডের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সারের পটাস, এমোনিয়া ও সোডা প্রভৃতির সহিত উহার এসিড সংযুক্ত হইয়া এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ দ্রবণীয় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এইজন্য দেখা যায়, যে সাররাশি পচিয়া তাহা হইতে যে এক প্রকার তরল পদার্থ নিঃসৃত হয় তাহার বর্ণ কাল। সারে যে নাইট্রোজন আছে তাহা হইতেই এমোনিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এমোনিয়া সংসৃষ্ট কোন কোন যৌগিক পদার্থের কর্ত্তৃক এমোনিয়া বায়ুতে বিকীর্ণ হইয়া যায়। পচিবার সময় সারের জৈব পদার্থ কমিয়া যায় এবং খনিজ পদার্থ সেই পরিমাণে বাড়ে। সারের জৈবপদার্থ হ্রাস হইবার কারণ এই যে, পচন কালে উহা হইতে কার্ব্বনিক এসিড, কার্ব্বনিক অকসাইড, ও মার্সগ্যাস নামক কতকগুলি উদ্বেয়বাষ্প জন্মিয়া বায়ুতে বিলীন হইয়া যায়। টাটকা সার অপেক্ষা শুষ্ক পচা-সারে নাইট্রোজন অধিক থাকে। সারের গুণ, এবং জমিতে প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা কিরূপ ফল পাওয়া যায় তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে পারা যায়। এক বিঘা জমিকে সমান সমান তিন ভাগ করিয়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে যথাক্রমে

যদি, গো, অশ্ব ও মেষ এই তিন জন্তুর মলসার সমান পরিমাণে দিয়া ধান্য বা গোধুম বপন করা যায় তবে ভিন্ন ভিন্ন সারের কার্য্যকারিতা ও ফসলের তারতম্য নিশ্চয়ই দেখা যাইবে।

রৌদ্র ও বাতাসে সারের কিছুই নষ্ট হয় না, কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। সাররাশি হইতে যে কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ বহির্গত হয়, উহাতে নাইট্রোজেন, পটাস প্রভৃতি ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদক সকল পদার্থই থাকে। যত্নপূর্ব্বক সার রক্ষা না করিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। অধিক পুরাতন হইলেও সার ভাল থাকে না। পূর্ব্বোক্ত তরল পদার্থের সহিত চূণ কদাচ মিশাইবেনা, তাহা হইলে সারের প্রধান বস্তু এমোনিয়া নষ্ট হইবে। যদি উহার সহিত কিছু মিশান আবশ্যক হয় তবে জিপ্‌সম্ নামক পদার্থ মিশাইলে চলিতে পারে। সার ভাল হইলে শস্যের ফলন অধিক হয়। যাহারা সার রীতিমত রাখিতে পারেনা তাহারা জমি আবাদের ৬ মাস পূর্ব্বে টাট্‌কা সার প্রত্যহ জমিতে দিতে পারে, সে সময়ে উহা জলে ধৌত হইলেও মৃত্তিকার গুণে সারের কয়েকটী পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া মাটিতেই উহা বর্ত্তমান থাকে। টাটকা সার জমিতে দিবার পরেই ভূমি কর্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। আটাল মৃত্তিকাতে টাটকা সার জমি আবাদের ৬ মাস পূর্ব্বে এবং বেলে মৃত্তিকায় পচাসার জমি আবাদের কিছু পূর্ব্বে দিতে হইবে। সার যত চূর্ণ হয় জমিতে ততই সমান রূপে ছড়াইয়া দিতে পারা যায়।

গুয়ানোসার। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরু দেশের উপকূলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও পাহাড় আছে। ঐ সকল স্থানে এক প্রকার সামুদ্রিক পক্ষী বাস করে, তাহাদের সংখ্যা

এত অধিক যে অল্পকাল মধ্যে এক একটী দ্বীপ তাহাদের মৃত দেহ ও বিষ্ঠায় পূর্ণ হইয়া উঠে। শুষ্ক হইলে উহাকে গুয়ানো সার কহে, উহা অতি উৎকৃষ্ট সার। কৃষিকার্য্যের জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ ইউরোপে আনীত হইয়া থাকে। যে সকল স্থানে সমুদ্র তরঙ্গ বা জোয়ারের জল উঠে না এবং বৃষ্টি ও প্রায় হয় না, কেবল সেই সকল স্থানে এই সার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সূর্য্যকিরণে শুষ্ক হইলে পর উহা আর বিকৃত হয় না।

গুয়ানো সার ধূসর, পীত ও মেটে প্রভৃতি নানাবর্ণের হইয়া থাকে, ইহা চূর্ণ করা কঠিন এবং ওজনে অত্যন্ত হাল্‌কা। সারের প্রায় যাবতীয় উপাদান ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এমোনিয়া শতকরা ৬ হইতে ১৩ ভাগ, ফস্ফরিক এসিড় ১০ হইতে ১৩ ভাগ, ক্ষার যুক্ত খনিজ পদার্থ ৭ হইতে ১৩ ভাগ, পর্য্যন্ত আছে। গন্ধকদ্রাবক যুক্ত হইলে উহা জলে গলে এবং জমিতে দিবার সুবিধা হয়। ধান্য ফসলের পক্ষে উহা অতি উৎকৃষ্ট সার। বীজবপনের পূর্ব্বে বিঘা প্রতি এক মণ করিয়া জমিতে ছড়াইয়া মৈ দিয়া সমান করিতে হয়। সুপারফস্ফেট নামক সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ঘাস, শাক সবজী ও আলুর জমিতে দেওয়া হয়। এই সার প্রতি মণ ৫।৬ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

অস্থিসার। অগ্নিতে হাড়ের জৈবাংশ পুড়িয়া গেলে উহা অতি হাল্‌কা হয়। জৈবাংশে ওসিন নামক একটী যৌগিক পদার্থ আছে। গোজাতীয় পশুর অস্থিতে যে ওসিন আছে, তাহার শতকরা ৫০ ভাগ কার্ব্বন, ৭ ভাগ হাইড্রোজন, ও ২৪ ভাগ

অকসিজন এবং সামান্য পরিমাণে গন্ধক আছে। ওসিন জলে গলেনা কিন্তু অধিক ক্ষণ সিদ্ধ করিলে উহা হইতে যে এক প্রকার কোমল পদার্থ বাহির হয় তাহা জলে গলে। কাষ্ঠাদি যুড়িবার জন্য যে শিরীষ ব্যবহৃত হয় তাহা হাড় হইতে প্রস্তুত হয়, ইহা ও ওসিনের সদৃশ পদার্থ। অস্থিতে যে যে পদার্থ আছে তন্মধ্যে ওসিন অতিশয় উর্ব্বরতা সম্পাদক। শুষ্ক হাড়ের ওজনের শতকরা সাড়ে চারি ভাগ এমোনিয়া আছে। গোহাড়ে শতকরা ৩২ ভাগ জৈব পদার্থ ও ৬৮ ভাগ ভস্ম বা খনিজ পদার্থ। শেষোক্ত পদার্থ মধ্যে কার্ব্বনিক্ ডাইঅকসাইড্ শতকরা ৬.২, ফস্ফরিক এসিড ৪০, ক্লোরিণ .২, ফ্লুওরিণ .৩, চূণ ৫৩, ও ম্যাগ্নেসিয়া .৩ ভাগ।

হাড় বড় হইলে পচিতে অধিক সময় লাগে এজন্য উহা চূর্ণ করিয়া জমিতে দিলে শীঘ্রই উহার ফল পাওয়া যায়, কিন্তু হাড় চূর্ণ করা সহজ নহে। হাড় চূর্ণ করিবার একটী সহজ উপায় আছে; হাড়ের ওজনের এক তৃতীয়াংশ আটাল মাটির কর্দ্দম উহাতে মাখাইয়া একটী গর্ত্তমধ্যে রাখিয়া ২।৩ ইঞ্চি পুরু করিয়া মাটিদ্বারা গর্ত্তের উপরিভাগ ঢাকিয়া দিয়া, মধ্যে মধ্যে উপর-কার মাটি চোনা দিয়া ভিজাইয়া দিতে হইবে। মাটি যেন সর্ব্বদাই ভিজা থাকে, ২।১ মাস এইরূপে রাখিলে দেখা যাইবে যে পূর্ব্বাপেক্ষা হাড় গুলি অনেক নরম হইয়াছে, তখন ঢেঁকিতে কুটিয়া চালিয়া লইলেই অস্থিচূর্ণ প্রস্তুত হইবে। পোড়াইলে হাড়ের নাইট্রোজন নষ্ট হইয়া যায়, তাহা নাহইলে উহা পোড়াইয়া সহজে চূর্ণ করা যায়। এদেশে সকল স্থানেই যথেষ্ট ভাগাড় আছে, সংগ্রহ করিলে প্রতিবৎসর অনেক হাড় পাওয়া যায়।

সংক্রামক রোগে এবং অযত্ন ও পালনদোষে প্রতিবৎসর যে কত গরু মরিয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই, এতদ্ব্যতীত কসাই-গণও বিস্তর গোহত্যা করিয়া থাকে।

ইউরোপীয় বণিকগণ চিনি পরিষ্কার করিবার জন্য অস্থির অঙ্গার ব্যবহার করেন। ঐ কার্য্য হইয়া গেলে পরিত্যক্ত অঙ্গার চূর্ণ করিয়া জমিতে দিলেও চলিতে পারে। এই সার মূলকজাতীয় ফসল সমূহের এবং ঘাসের জমির পক্ষে বড় উপকারী। পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য, তৃণভোজী ও মাংসাশী জন্তুগণের অস্থির উপা-দানের কিছু ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। হাড়ে ক্যালসিক্ ফস্ফেট্ নামক একটী পদার্থ আছে, ভূমির যে তিনটী পদার্থ মৃত্তিকায় থাকিলে ভূমি উর্ব্বরা হয় ক্যালসিক ফস্ফেট উহাদের অন্যতম। যেস্থানে অপর্য্যাপ্ত মৎস্য পাওয়া যায় সে স্থানে তাহাও সার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। জান্তব পদার্থ মাত্রেই উৎকৃষ্ট সার হইতে পারে। কোন কোন নগরে বিষ্ঠা হইতে এক প্রকার সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। সকল সারই কিছু দিন পরে মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া যায়, ইহা জানিয়াও লোকে বিষ্ঠার কথা শুনিলেই সেই মৃত্তিকা ও তাহাতে যে উদ্ভিদ জন্মে তাহার প্রতি অতিশয় ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে।

সুপারফস্ফেট সার। পূর্ব্বে এই সার ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে হাড় ও গন্ধক দ্রাবক দ্বারা প্রস্তুত হইত, কিন্তু এক্ষণে যথেষ্ট অস্থি তথায় পাওয়া যায় না, এজন্য অস্থিভস্ম বা অঙ্গার এবং তদ্দেশীয় নানাবিধ খনিজ ফস্ফেট পূর্ব্বোক্ত দ্রাবকে গলাইয়া উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইসার জলে গলেনা, অধিক পরি-মাণে গন্ধক দ্রাবক সংযোগে উহার উপাদান গুলি বিশ্লিষ্ট হইলে

তখন জলে গলে। এদেশে গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত করিবার কোন কারখানা নাই। এই দ্রাবক তিন প্রকারের আছে, তন্মধ্যে যাহাকে শ্বেতদ্রাবক কহে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৮৪৫ এবং উহাই হাড়ের সার প্রস্তুত জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সার ব্যবসায়ীরা প্রথমতঃ দ্রাবকের উগ্রতা ও খনিজ ফস্ফেটের উপাদান পরীক্ষা করিয়া কোন্ বস্তুর কি পরিমাণে আবশ্যক হইবে তাহা স্থির করেন

অস্থি কিংবা প্রস্তর খণ্ড গুলিকে প্রথমতঃ চূর্ণ করিয়া একটি আবদ্ধ পাত্রে স্থাপন করত প্রয়োজন মত গন্ধক দ্রাবক উহাতে ঢালিয়া দিয়া অনবরত নাড়িতে হয়। দ্রাবক সংযোগ মাত্র হাড় হইতে কার্ব্বনিক অকসাইড, হাইড্রোফ্লুওরিক এসিড্ এবং ফ্লুওরাইড্ অব সিলিকন নামক তিনটী বিষাক্ত বাষ্প উঠিতে থাকে, ইহা বায়ুতে মিশিলে বায়ু বিষাক্ত হইয়া যায় এজন্য একটী দীর্ঘ লৌহনলের ভিতর দিয়া ঐ বাষ্প চালিত করা কর্ত্তব্য। নলটী শীতল জলে মগ্ন রাখিলে উহার ভিতরের বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বায়ু দূষিত করেনা। কয়েক ঘণ্টা পরে আবদ্ধ পাত্রের নীচের একটী দ্বার খুলিয়া দিলে অন্য একটী আবদ্ধ পাত্রে প্রস্তুত সার পড়িবে। এইরূপে অনেক সার জমিলে, ২।১ মাস ঘরে রাখিয়া বস্তাবন্দী করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। খনিজ সুপার-ফস্ফেট প্রস্তুত কালে উহার কিয়দংশ দ্রবীভূত হয না, তাহাতে অস্থিচূর্ণ বা জিপ্‌সম্ মিশ্রিত করিয়া পুনরায় দ্রবীভূত করিতে হয়। এই সার প্রস্তুত করার জন্য এক প্রকার নুড়ি পাথর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নুড়ি পাথরকে খনিজ ফস্ফেট কহে। উহাতে হাড়ের ন্যায় ফস্ফেট আছে।

ফস্ফরিক এসিডের সহিত এলুমিনম্, ম্যাগ্নেসিয়া ও ক্যাল-সিয়ম সংযুক্ত হইয়া যে সকল নুড়ি পাথরের উৎপত্তি হয় উহা ভূস্তরের কোন কোন স্থানে এত অধিক পাওয়া যায়, যে সার প্রস্তুতের কারখানায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইংলণ্ডের অন্তর্গত কেম্ব্রিজ শায়ারে মৃত্তিকার নীচে কপ্রোলাইট্ নামক এক প্রকার নুড়িপাথর পাওয়া যায়। কেহ কেহ ঐ প্রস্তর খণ্ড গুলিকে বিলুপ্ত জীবসমূহের রূপান্তরিত অস্থিকঙ্কাল বলিয়া অনুমান করেন। উহাতে শতকরা ৫০।৬০ ভাগ ফস্ফেট্, ১৫।১৮ ভাগ ক্যাল্সিক কার্ব্বনেট্, ৮।১০ বালুকা ও অন্যান্য পদার্থ আছে। ঐ রূপ প্রস্তর স্পেন, নরওয়ে, ইউনাইটেড-ষ্টেট প্রভৃতি অনেক দেশে পাওয়া যায়। চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষেও উহা যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে। নরওয়ের পাথর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সুইডেন, নরওয়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট আকরিক পদার্থ পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই দেখা যায় না। তথাকার লৌহ যেমন উৎকৃষ্ট নুড়ি পাথর ও তদ্রূপ।

ইউরোপে যাঁহারা এই সারের কারখানা স্থাপন করিয়া উহার ব্যবসায় করেন তাঁহারা বিপুল ধনশালী হইয়াছেন। সুপার-ফস্ফেট সার অধিক দিন রাখিলে উহার দ্রবণীয় ফস্ফেট শতকরা ১ হইতে ৫ ভাগ পর্য্যন্ত কমিয়া যায়; এজন্য বিচারালয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অনেক সময় প্রবঞ্চনার অভিযোগ উপস্থিত হয়। রসায়নবেত্তাগণ ফস্ফেট কমিয়া যাইবার কারণ নির্দ্দেশ এই করেন যে, ঐ সারের অন্তর্গত এলুমিনা ও লৌহের যে অক্সাইড্ আছে তাহা উহারই ফস্ফরিক এসিডের সহিত

রাসায়নিক সংযোগে, ক্যালসিক ফস্ফেট্, এলুমিনম ফস্ফেট্ ও লৌহ ফস্ফেট প্রভৃতি যে কতকগুলি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা জলে গলেনা। কোন কোন নুড়িপাথরের এলুমিনা অক্সাইড্ ও লৌহঅকসাইড দ্রাবকেও গলেনা। সুপারফস্ফেট জমিতে প্রয়োগ করিলে মৃত্তিকাস্থিত চূণের রাসায়নিক কার্য্যবিশেষ দ্বারা, সারের দ্রবণীয় ফস্ফেট অবিলম্বেই অদ্রবণীয় ফস্ফেটে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মৃত্তিকায়, লৌহ অকসাইড, এলুমিনা ও ম্যাগনেসিয়া স্বভাবতঃই অল্প পরিমাণে আছে, মৃত্তিকায় চূণের অংশ না থাকিলেও ঐ সকল পদার্থ সংযোগে ফস্ফেট সার অধঃক্ষিপ্ত হওয়াতে জমির উপর গাঢ় মণ্ডের আকার ধারণ করে। বর্ষাকালে এই সার জমিতে দেওয়া কর্ত্তব্য কারণ তখন ঐ মণ্ড জলে গলিয়া উদ্ভিদ পোষণ করিতে পারে।

যাঁহারা হাড় স্পর্শ করিতে চাহেন না তাঁহারা খনিজ সুপারফস্ফেটসার অনায়াসেই ব্যবহার করিতে পারেন। চিনি পরিষ্কারের পর যে অস্থি-অঙ্গার পাওয়া যায়, চূর্ণ করিয়া তাহাও ব্যবহার করিতে পারেন। এই সার শাকসবজী, ধান্য, ইক্ষু, শিম্বী, ও মূলক জাতীয় সমুদয় ফসল এবং নানাবিধ ঘাসের জমিতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। প্রতি বিঘায় দুই মণ দিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যদি গোবরসার প্রচুর পাওয়া যায়, তবে উহার অর্দ্ধেক দিলেই চলিতে পারে। জমিতে দিবার সময় এই সারের ২।৩ গুণ ভস্ম বা আটাল মৃত্তিকাচূর্ণ মিশাইয়া জমির উপর সমান ভাবে ছড়াইয়া দিতে হয়। ঘাসের জমিতে এই সার দিতে হইলে বৃষ্টির সময় দেওয়া উচিত।

উদ্ভিজ্জ সার। জমিতে এই সার দিলে মৃত্তিকা সছিদ্র

হয় এবং তাহাতে নাইট্রোজন জন্মে। কাঁচা গাছগাছালি রাশীকৃত করিয়া রাখিলে কিছু কাল পরে উহার ভিতর গরম হইয়া পচিতে আরম্ভ হয়। উদ্ভিদ মাত্রেই কাঁচা অবস্থায় পচিয়া থাকে, শুষ্ক হইলে শীঘ্র পচেনা। মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিলে গাছ গাছালি অতি শীঘ্রই পচিয়া থাকে, এই জন্য গাছ পালা গুলিকে কাঁচা অবস্থায় ভূমিকর্ষণ করিয়া মাটি চাপাদিলে সার দেওয়ার কার্য্য হয়। কৃষকগণ ধান্যাদি ছেদন করিবার সময় ধানঝাড়ের গোঁড়ার কতকটা জমিতেই রাখিয়াদেয় ও ভূমিকর্ষণের পর উহা পচিয়া সার জন্মে। এইরূপ করায় জমিতে অল্প মাত্রায় উদ্ভিজ্জসার দেওয়া হয়।

নীলকুঠীতে যে নীলের সিটি পাওয়া যায় তাহা উত্তম সার। আলুর জমি হইতে আলু তুলিয়া লইয়া উহার গাছ গুলিকে সেই স্থানে মাটি চাপা দিয়া রাখা বিধেয়। এরূপ করিলে অন্য সারের বড় প্রয়োজন হয় না। খইল মাত্রেই উদ্ভিজ্জসার। গাছ পালা পোড়াইয়া ভস্ম করিলেও সার হয়, বটে কিন্তু উদ্ভিজ্জ কাঁচা অবস্থায় জমিতে দেওয়া উচিত, কারণ পোড়াইলে সারের নাইট্রোজন নষ্ট হইয়া যায়। চাক্ষেত্রে প্রতি বৎসর শীতকালে চা গাছ গুলি ছাটিয়া দেওয়া হয়, পরে জমি খনন কালে ঐ সকল কর্ত্তিত ডাল পালা মাটিতে পুঁতিয়া দিতে দেখা যায়। ইহাতেই চা ক্ষেত্রে কাঁচাসার দেওয়ার ফল হইয়া থাকে। নগরের যে সকল আবর্জ্জনা ময়লার গাড়ি করিয়া লইয়া যায়, তাহা পোড়াইলে এক প্রকার সার প্রস্তুত হয়।

জমিতে কাঁচাসার দিবার রীতি এদেশে নাই। কোন কোন জমিতে স্বভাবতঃ এত আগাছা জন্মে যে কেবল দুই

একবার লাঙ্গল দিয়া জমিতে চাষ দিলেই কাঁচা সার দেওয়া হয়; কিন্তু ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, নিড়ান খরচ বাঁচাইবার ও জমিতে অধিক আগাছা না জন্মিতে পারে তজ্জন্য ঐ সকল আগাছা পুষ্পিত হইবামাত্রই এবং বীজ জন্মিবার পূর্ব্বেই ভূমি কর্ষণ দ্বারা মারিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। এরূপ না করিলে অধিক আগাছা জন্মিয়া ফসলের সম্যক পরিপুষ্টির ব্যাঘাত করে।

গ্রীষ্মকাল কাঁচাসার দিবার উপযুক্ত সময়। গাছ পালা তখন অন্য কাল অপেক্ষা সত্বরেই পচিয়া যায়। এ দেশে পুরাতন পুষ্করিণী, বিল, খাল ও খানা ডোবায়, শৈবাল ও পানা প্রভৃতি নানাবিধ জলজ উদ্ভিদ যথেষ্ট পাওয়া যায়। যে সকল উদ্ভিদে খণিজপদার্থ অধিক আছে, সারের জন্য তাহাই ব্যবহার করা উচিত। দেশী চিনি প্রস্তুত করিতে যে পাটা সেওলা ব্যবহৃত হয়, চিনি পরিষ্কার হইয়া গেলে তাহা সারের জন্য ব্যবহার করিতে পারা যায়। শৈবাল প্রভৃতিতে নাইট্রোজন ও এমোনিয়া অধিক থাকায় তদ্দ্বারা ভূমি উর্ব্বরা হইয়া থাকে।

জলজ উদ্ভিদ ২।৩ ইঞ্চি মাটি চাপা পড়ে, এরূপ করিয়া জমিতে দিতে হইবে। আলুর জমিতে দিলে উহা দ্বারা গোবরসারের তুল্য ফল পাওয়া যায়। শুষ্ক খড় বিচালিও উত্তম সার; কিন্তু শুষ্ক হইলে উহা সহজে পচেনা বলিয়া প্রথমতঃ পশুগণের শয্যায় পাতিয়া দিয়া উহা মলমূত্রসিক্ত করিয়া লইলে শীঘ্রই পচিয়া যায়। পশুগণের খাদ্য তৃণাদি কখনই সারের জন্য ব্যবহার করা উচিত নহে, বরং উহাদের খাইবার পরে যাহা নষ্ট প্রায় হইয়া যায় তাহাই সার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ফসলসমূহ পাকিয়া অতিশয় শুষ্ক হইয়া গেলে যদি তাহা ছেদন করা যায়

তবে উহাদের তৃণাদিতে ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদক পদার্থের পরিমাণ হ্রাস হয় ও উহা পশুগণের অপকৃষ্ট খাদ্য হয় এবং তদুৎপন্ন বিষ্ঠাদিতে যে অধিক সারবত্তা থাকে না, কৃষকগণ এ বিষয় এক বারও চিন্তা করে না। শুষ্ক তৃণাদি পচিতে আরম্ভ হইলে বেলে জমিতে এবং উহা পচিবার পূর্ব্বে আটাল জমিতে দিতে হয়। ধানের তুঁস, চাউলের কুঁড়ো ও ময়দার চোকল কয়েকদিন গোমূত্রে পচাইয়া, আলু, মূলা, গাজর, শালগম প্রভৃতির বীজের সহিত মাটিতে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া দিলে, ঐ বীজ সকল শীঘ্রই অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং উহাদের আকার ও বৃহৎ হয়।

গাছ অপেক্ষা উহার বীজে সারের উপাদান অধিক থাকে, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ কখন খাদ্য শস্যাদি সারের জন্য ব্যবহার করেনা। মনুষ্য ও গবাদির আহারের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই কেবল সারের জন্য ব্যবহার করা যায়। পেষণ যন্ত্রে পিষ্ট হইয়া তৈল বাহির হওয়ার পর তৈলদবীজের যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে খইল কহে। খইল অতি উৎকৃষ্ট সার। তিসি, পোস্ত, তিল, সরিষা রেড়ি, নারিকেল, বাদাম, কার্পাসবীজ ও কুসুম প্রভৃতি নানাবিধ বীজ হইতে তৈল ও খইল প্রস্তুত হয়। প্রতি বিঘায় এক বা দেড় মণ খইল তাহার ২।৩ গুণ মৃত্তিকা চূর্ণের সহিত মিশাইয়া জমির উপরে ছড়াইয়া দেওয়া অথবা গর্ত্ত করিয়া বীজের সহিত পুঁতিয়া দেওয়া উচিত।

ইক্ষুক্ষেত্রে ও পানের বরজে খইল সারের ব্যবহার অধিক হইয়া থাকে। গোল আলুর জমিতে এই সার দিলে, আলু ছোট ও অল্প হয় এবং উহার পাতা ও গাছ অতিশয় সতেজ ও বড়

হইয়া যায় এবং ফলন অতি অল্প হয়। কোন ফসলের এই অবস্থা হইলে কৃষকগণ উহাকে "পাতাইয়া যাওয়া" কহে। খইলে শতকরা ৪।৫ ভাগ নাইট্রোজন আছে, খইল পোড়াইলে শতকরা ৬ ভাগ ভস্ম অবশিষ্ট থাকে। এই ভস্মে পটাসিক ফস্ফেট্ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। খইল শীঘ্র পচে এজন্য জমিতে দিলে উহা অনতিবিলম্বেই উদ্ভিদ পোষক হয়। অন্যান্য সারের সহিত খইল মিশাইয়া দিলে তাহাদের তেজ বাড়িয়া থাকে। পশুগণের আহারার্থ খইল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

অঙ্গারচূর্ণ এবং ঝুল কালি এক প্রকার উদ্ভিজ্জ সার। উহারা বায়ু ও মৃত্তিকার বিষাক্ত পদার্থ নষ্ট ও দুর্গন্ধ দূর করে এবং জলের লবণময় পদার্থের বিশ্লেষণ ও বায়ু হইতে অকসিজন শোষণ করে। আঙ্গারের এই গুণ থাকায়, তরল সার, এমোনিয়া-দ্রবণ ও বিষ্ঠার সহিত সচরাচর ইহা মিশ্রিত হইয়া থাকে। ইহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি আছে। ফুলের গাছের গোড়া খুড়িয়া তাহার চতুর্দ্দিকে দিলে ফুলের রং উজ্জ্বল ও গাঢ় হইয়া থাকে। বাষ্পীয়যন্ত্রের ধুম নির্গম জন্য যে চিম্‌নি দৃষ্ট হয় তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ঝুল ও ভূসা পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে এমোনিয়া, জিপসম্, নাইট্রিক্এসিড্ প্রভৃতি পদার্থ আছে। কোন কোন স্থানে ঘাসের জমিতে এই সার দেওয়া হয়। যব ও গমের ক্ষেত্রে এই সার সোডিক নাইট্রেটের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে এবং ফসলের, ফলন বাড়ে। গাজরের জমিতে বিঘাপ্রতি ১৮ মণ ঝুল ও ২ মণ লবণ মিশাইয়া দিলে প্রচুর ফসল জন্মে। প্রচুর অস্থিচূর্ণ এবং গোবর সার দিলেও সেরূপ ফসল জন্মে না। যে ঘাসের জমিতে এই সার দেওয়া

যায় সে জমিতে গাভী চরাইলে তাহাদের দুগ্ধে এক প্রকার অস্বাভাবিক গন্ধ ও স্বাদ অনুভূত হয়, এজন্য পশুপালকগণ ঐ জমির ঘাস ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেনা।

চূণসার। চূনামাটি, চাখড়ি, ঘুটিং, চূনাপাথর প্রবাল ও সামুদ্রিক জীব বিশেষের আবরণ প্রভৃতিতে চূণের অংশ আছে। চাখড়ি, বা চূনাপাথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড একটি বোতলের মধ্যে রাখিয়া, অল্প জলমিশ্রিত মিউরিয়েটিক্ এসিড্ ঢালিয়া দিলে উহা অবিলম্বেই ফুটিতে থাকে ও প্রভূত পরিমাণে কার্ব্বনিক-ডাইঅকসাইড্ বাষ্প উত্থিত হয়। একটী প্রশস্ত পাত্রে চূণের জল রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া যদি ঐ বাষ্প চালিত করা যায় তবে, উহা দুগ্ধের ন্যায় হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ কণিকা অধঃক্ষেপ করে তাহাকে "ক্যালসিক্ কার্ব্বনেট্" কহে। ইহার শতকরা ৪৪ ভাগ কার্ব্বনডাইঅকসাইড্ এবং ৫৬ ভাগ চূণ। চাখড়ি, মার্ব্বল পাথর ও চূণাপাথরের অধিকাংশই ক্যালসিক্ কার্ব্বনেট্। চাখড়ির অণুসমূহ বিরল-সন্নিবিষ্ট এবং মার্ব্বল পাথরের অণুসমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট, এজন্য চাখড়ি অপেক্ষা মার্ব্বল পাথর অধিক কঠিন।

চাখড়ি ও চূণা পাথরের সমস্তই খনিজ পদার্থ নহে। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষায় যে অধঃক্ষিপ্ত ক্যালসিক্ কার্ব্বনেট্ পাওয়া যায় উহার অধিকাংশই সামুদ্রিক জীব বিশেষের অস্থিচূর্ণ বা প্রবাল দ্বীপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলেই তাহা স্পষ্ট জানা যায়। এক কালে ঐ সকল পদার্থ সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, বহুকাল পরে সে স্থানে চাখড়ির স্তর উৎপন্ন হইয়াছে। স্রোতো বিশিষ্ট সাগরতলে উক্ত স্তর গঠিত হওয়ায় চাখড়ি ও

চূণাপাথরে অল্প মাত্রায় বালি ও মাটির ন্যায় দ্রু পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহা দ্রাবকে গলেনা। চূণ ও ফস্ফরিক এসিড্ সংযোগে "ক্যালসিক্ ফস্ফেট্" নামক এক প্রকার যৌগিক পদার্থ জন্মে। জীবিত বা মৃতাবস্থায় সামুদ্রিক জীবের অস্থি ও আবরণে উহা বিদ্যমান থাকে।

চূণা পাথরেও ফস্ফরিক এসিড্ আছে; উহাতে অদ্রবণীয় ভাগ যত অধিক, ফস্ফরিক এসিড ও তত অধিক থাকে। কারণ চাখড়ি ও চূণাপাথর, আদৌ যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা পুরাকালীন জীবাবশেষ মাত্র। জীব দেহের কোন কোন স্থানে গন্ধকের অংশ আছে এজন্য চাখড়িও চূণাপাথরেও গন্ধক-দ্রাবক দেখিতে পাওয়া যায়। উহা চূণ সংযোগে জিপ্সমের ন্যায় দেখায়, কিন্তু উহার পরিমাণ অত্যল্প। ম্যাগনেসিয়া বিশুদ্ধ বা বিমিশ্র অবস্থায় চাখড়ি বা চুনা পাথর মাত্রেই বিদ্যমান থাকে।

ক্যালসিক কার্ব্বনেট্ ও ক্যালসিক ফস্ফেট এই দুই পদার্থ দ্বারা সমুদ্রতলে প্রবালদ্বীপ নির্ম্মিত হয়। এই দুই পদার্থের শতকরা ১৪ ভাগ জৈব পদার্থ, এজন্য প্রবাল-বালুকা প্রয়োগে ভূমি উর্ব্বরা হইয়া থাকে। শঙ্খ শম্বুকাদি নানাপ্রকার জীবের আবরণ, সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে সূক্ষ্মাকারে চূর্ণীকৃত হইয়া এক-প্রকার বালুকা জন্মে। অন্য বালি মিশ্রিত থাকায় উহাতে জৈব-পদার্থ অধিক থাকেনা। সাগরোপকূলের স্থান বিশেষে এই বালি যথেষ্ট পাওয়া যায়। গোচারণ-ক্ষেত্রে এবং যে সকল জমিতে উদ্ভিজ্জজাত মৃত্তিকা অধিক, সেই সকল জমিতে ঐ বালুকা প্রয়োগ করিলে জমি উর্ব্বরা হইয়া থাকে। চূণামাটিতে ক্যালসিক্ কার্ব্বনেট্, চূণ, বালি, কর্দ্দম, বা উদ্ভিজ্জজাত মাটি বিভিন্ন

পরিমাণে মিশ্রিত আছে এবং উহাতে ৫ হইতে ৮০।৯৭ ভাগ ক্যালসিক্ কার্ব্বনেট্ আছে। ফলতঃ উহাতে চূণের ভাগ অধিক থাকিলেই কৃষিকার্য্যের অধিক উপযোগী হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ চূণাপাথর পোড়াইলে প্রতি মনে ২৫ সের চূণ পাওয়া যায়। ঘুটিং অথবা চূণাপাথর পাথুরিয়া কয়লা বা কাষ্ঠ দ্বারা ভাটিতে পোড়াইলে অগ্নিতাপে উহার অন্তর্গত কার্ব্বনিক এসিড বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়া বিশুদ্ধ চূণ অবশিষ্ট থাকে। ইহাকেই বাখারি চূণ বলে। পোড়াইবার পর উহার ক্ষারকতা গুণ জন্মে। চূণের আস্বাদন উগ্র ও ক্ষারযুক্ত; জল বা জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া প্রথমত উহা ধূমিত হয় ও ফুটিয়া উঠে পরে স্বতঃই ধূলার ন্যায় চূর্ণ হইয়া যায়। চূণের ওজণের ৩৭২ গুণ শীতল জল মিশাইয়া স্থিরভাবে রাখিলে তাহার উপরে যে পরিষ্কার জল জমে, তাহাকেই চূণের জল কহে। ধূলার ন্যায় চূর্ণ দেখাইলেও চূণে শতকরা ২৪ ভাগ জল থাকে, ইহারই রাসায়নিক নাম "হাইড্রেট্ অব লাইম"। পোড়ান চূণে জল না দিয়া যদি অনাবৃত স্থানে রাখা যায়, তবে উহা বায়ু হইতে বাষ্প শোষণ করতঃ চূর্ণীকৃত হইয়া যায়; এরূপ হইলে উহাতে "হাইড্রেট অব ক্যালসিয়ম্ ও কার্ব্বনেট্ অব ক্যালসিয়ম" এই উভয় পদার্থই জন্মে।

জলমিশ্রিত হইলেও পোড়ান চূণের ক্ষারকতা গুণ নষ্ট হয় না, কিন্তু এই রূপে চূর্ণ হইবার পরে যদি খোলা বাতাসে কিছু দিন রাখা যায়, তবে উহা বায়ু হইতে কার্ব্বনিক এসিড শোষণ করিয়া পুনরায় কার্ব্বনেটে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। চূণের এই গুণ থাকায় এতদ্দারা বায়ু পরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধ দূর হইয়া থাকে।

পোড়ান চূণ জল সংযোগে যেমন একদিকে ধূলার ন্যায় চূর্ণ হইতে থাকে, তেমনই আবার উহা বায়ু হইতে কার্ব্বনিক্‌ এসিড্‌ শোষণ করিতে থাকে, এই উভয় প্রক্রিয়াই যুগপৎ নির্ব্বাহ হয়। এজন্য জমিতে প্রয়োগ করিবার কিছু দিন পরে উহার জারকতা গুণ লুপ্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া যায়।

বাখারি চূণ ধূলার ন্যায় হইলে জমির উপর সহজেই ছড়াইয়া দিতে পারা যায়; না পোড়াইয়া চূণাপাথর চূর্ণ করাও সহজ নহে এবং তাহা হইলেও উহার জারকতা গুণ জন্মে না। এই জারকতা গুণেই চূণ মৃত্তিকান্তর্গত জৈবপদার্থের উপর সম্যক কার্য্যকারী হইয়া থাকে। জারকতা গুণ না থাকিলে চূণ দ্বারা আশু ফল পাওয়া যাইত না। চূণাপাথরে লৌহ ও গন্ধকের অংশ আছে; পাথুরিয়া কয়লাতেও গন্ধকের অংশ আছে এজন্য কয়লা দ্বারা চূণ পোড়াইলে, কয়লার অন্তর্গত গন্ধক ও বায়ুর অকসিজেন চূণের সহিত সংযুক্ত হইয়া জিপসম্‌ নামে একটী যৌগিক পদার্থ জন্মে, এবং চূণাপাথরে স্বভাবতঃ যে পরিমাণ জিপসম্‌ আছে তাহার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়।

চূণাপাথরে বালি ও মাটির ন্যায় যে পদার্থ দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে সিলিকা আছে। পোড়াইবার সময় এই সিলিকা চূণের সহিত সংযুক্ত হইয়া "ক্যালসিক সিলিকেট" নামক একটি যৌগিক পদার্থ জন্মে। উদ্ভিদগণ বাখারি চূণ, ক্যাল্‌সিক্‌ সিলিকেট্‌ ও মৃত্তিকা হইতে স্ব স্ব দেহনির্ম্মাণোপযুক্ত, প্রয়োজন মত সিলিকা প্রাপ্ত হয়। চূণাপাথর দাহন রাসায়নিক ও শ্রামিক কার্য্যের ফল। রাশি রাশি পাথর চূর্ণ করিতে কত পরিশ্রমের

আবশ্যক, কিন্তু উহা পোড়াইয়া জল ঢালিয়া দিলেই কত সহজে তাহা সম্পন্ন হয়। যে ক্ষারকতা গুণে চূণ, মৃত্তিকার উদ্ভিজ্জ পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করতঃ মৃত্তিকার অন্যান্য উপাদানকে শিথিল ও উদ্ভিদপোষণযোগ্য করিয়া দেয়, না পোড়াইয়া কেবল মাত্র চূর্ণ করিলে তদ্দ্বারা সে ফল পাওয়া যায় না। চূণের যৌগিক পদার্থগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভূমি উর্ব্বরা করে; কিন্তু চূণ স্বয়ং ভূমি উর্ব্বরা করেনা।

মৃত্তিকার প্রকৃতি, ভূমিকর্ষণের গভীরতা এবং মাটিতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ কি পরিমাণে আছে, এই সকল বিষয় অগ্রে বিবেচনা করিয়া, জমিতে কি পরিমাণ চূণ কত দিন অন্তর দিতে হইবে তাহা স্থির করা উচিত। আর্দ্র-ভূমিতে অধিক চূণের আবশ্যক এবং অগভীরকর্ষিত জমিতে অল্পমাত্রায় চূণ দিতে হইবে। পুরাতন ঘাসের জমিতে মধ্যে মধ্যে অল্প মাত্রায় চূণ ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। বন, জঙ্গল কাটিয়া আবাদযোগ্য জমিতে এবং অনেক দিনের পতিত ঘাসের জমিতে প্রথমতঃ অধিক মাত্রায় চূণ দেওয়া কর্ত্তব্য। ধান্য ও গোধূমের জমিতে ১০।১২ বৎসর অন্তর কিছু অধিক মাত্রায় চূর্ণ দিলে ভাল হয়।

চূণ স্বভাবতঃই মৃত্তিকার নীচে যাইয়া পড়ে। লাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকা উল্টাইয়া দিলে আবার উপরে উঠে। উদ্ভিজ্জ-জাত মৃত্তিকায় অধিক চূণের প্রয়োজন। আঁটাল মৃত্তিকার জল নিঃসরণের বন্দোবস্ত অগ্রে করিয়া পরে তাহাতে চূণ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বেলে মৃত্তিকাতে যদি আর্দ্রতা ও উদ্ভিজ্জাবশেষ অধিক না থাকে তবে সে জমিতে অন্য সারের সহিত চূণ মিশাইয়া দেওয়া উচিত। যে সারের সহিত চূণ

মিশাইলে সারের কোন বিকৃতি জম্মেনা কেবল সেই সারের সহিত চূণ মিশাইতে পারা যায়। মলমূত্রাদি জান্তব-সারের সহিত চূণ সংযোগ করা উচিত নহে। উৎকৃষ্ট জমি মাত্রেই অল্প মাত্রায় চূণ আছে। এদেশের জমিতে যে রূপ চাষ দেওয়া হয় তাহাতে ১০।১২ বৎসর অন্তর বিঘাপ্রতি ৩।৪ মন চূণ দেওয়া যাইতে পারে, অথবা অল্প মাত্রায় প্রতি বৎসরে বিঘাপ্রতি ২।১ মণ দিলেই যথেষ্ট হয়।

ঘাসের জমিতে চূণের আশ্চর্য্য ফল দেখিতে পাওয়া যায়। ঘাসগুলি কোমল, নিবিড়, ও পশুগণের পক্ষে সুস্বাদ ও অতিশয় পুষ্টিকর হইয়া থাকে। অত্যন্ত কঠিন আটাল মৃত্তিকাও চূণ প্রয়োগে অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা হয়, ফসলের ফলন বাড়ে, শস্যের গুণ ভাল হয় এবং উহা শীঘ্রই পরিপক হইয়া থাকে। চূণ দ্বারা জমির কীটাদি নষ্ট হয়। চূণ দেওয়া জমিতে যে যব জম্মে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট সুরা প্রস্তুত হয় এবং সে জমিতে মূলকজাতীয় ফসল উৎপাদন করিলে তাহা এত পুষ্টিকর হয় যে, উহা খাইয়া পশুগণ বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠে।

গাভীগণকে ঐ ফসল বা ঘাস খাওয়াইলে তাহাদের দুগ্ধের পরিমাণ অনেক বাড়ে, ও তাহাতে মাখনের ভাগ অধিক হয়। গ্রীষ্ম কালেও ঐ জমিতে অনেক দিন পর্য্যন্ত ঘাস কাঁচা থাকে। চূণ দ্বারা জমির যে উপকার হয় তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। প্রতি বৎসর কিছু কিছু হ্রাস হইয়া অবশেষে চূণ প্রয়োগের পূর্ব্বে মৃত্তিকার যেরূপ অবস্থা ছিল পরেও সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন সে মৃত্তিকা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহাতে যত চূণ দেওয়া হইয়াছিল মাটিতে তাহার কিছুই নাই, এবং

পুনরায় চূণ না দিলে তাহাতে কোন ফসল ভাল রূপ জন্মে না।

নানা কারণে চূণ জমি হইতে অপসৃত হয়। ঘাসের জমিতে চূণ দিলে তাহা নীচে পড়ে। পুনঃ পুনঃ কর্ষিত জমিতে ঐ অধঃপতিত চূণ দুই একবার উপরে উঠে বটে, কিন্তু শেষে এত নীচে পড়িয়া যায় যে, কর্ষণ সময়ে লাঙ্গল-ফলক ততদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করেনা। ফসলসমূহ মৃত্তিকা হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে চূণ শোষণ করে। বৃষ্টির জলে ক্যালসিক্ কার্বনেট্ দ্রব হয়। এজন্য বৃষ্টিকালে অনেক চূণ জমি হইতে ধৌত হইয়া যায়। উদ্ভিজ্জাদি পচিবার সময়ে তাহা হইতে যে এসিড্ জন্মে তদ্দ্বারাও চূণ দ্রবীভূত ও বৃষ্টিতে ধৌত হইয়া যায়। অতএব যে স্থানে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হয় সে স্থানে পুনঃ পুনঃ চূণ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ভূমিতে চূণ ব্যবহার করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। জৈব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ যে মৃত্তিকায় অল্প পরিমাণে আছে তাহাতে চূণ দিয়া কোন ফল হয় না। চূণ দিবার পর প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে তাহার ফল অধিক পাওয়া যায়। যতদিন পর্য্যন্ত উহা ভূমির উপরিভাগে অর্থাৎ এক ফুট গভীর মৃত্তিকামধ্যে থাকে ততদিন পর্য্যন্তই উহার কার্য্য-কারিতা দৃষ্ট হয়। চূণ দিলে ভূমির জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ সমূহ সত্বরেই নিঃশেষ হইয়া যায়, নতুবা ঐ সকল পদার্থ অনেক দিন পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় বর্ত্তমান থাকে। এই পদার্থ সমূহ নিঃশেষ হইলে তখন সে জমিতে চূণ দিলেও আর কোন ফল দর্শেনা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে চূণ স্বয়ং কোন কার্য্য করেনা, অন্যান্য উপাদানকে কার্য্যকারী করিয়া দেয়। মৃত্তিকায় যদি কোন এসিড্ থাকে, তবে

চূণ দিলে তাহা নষ্ট হয় এবং ঐ এসিড্, চূণ সংযোগে যে কতকগুলি দ্রবণীয় যৌগিকপদার্থ উৎপাদন করে তৎসমুদায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে উদ্ভিদ পোষণ করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ সকল পদার্থ দ্রবণীয় বলিয়া বৃষ্টিতে ধৌত হইয়া যাইতে পারে। চূণ ও এসিড্ সংযোগে আরও কতকগুলি অদ্রবণীয় পদার্থ জন্মে তৎসমুদায়ও মৃত্তিকাতেই বর্ত্তমান থাকে অথচ বৃষ্টিতে ধৌত হয় না। এই অদ্রবণীয় পদার্থ মৃত্তিকাস্থ লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ও এলুমিনাঘটিত কতিপয় লাবণিক পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়া উদ্ভিদের অনিষ্টকারী পদার্থকে নষ্ট করে। শেষোক্ত লাবণিক পদার্থ তিনটী সচরাচর মৃত্তিকাতেই বর্ত্তমান থাকে।

মৃত্তিকায় যদি পটাস্, সোডা ও এমোনিয়া ঘটিত কোন যৌগিক পদার্থ থাকে, তবে তাহা হইতে পটাস্, সোডা, এমোনিয়া প্রভৃতি চূণের শক্তি বিশেষ দ্বারা বিমুক্ত হইয়া উদ্ভিদপোষণ করিয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ পদার্থ বা মৃত্তিকার জৈবাংশ পচিবার সময় অতি ধীরে ধীরে নাইট্রোজনের উৎপত্তি হয়। কিন্তু জমিতে তাজা চূণ প্রয়োগ করিলে ঐ কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন হয় ও নাইট্রোজন পৃথক হইয়া পড়ে। এই নাইট্রোজন হইতে প্রথমে নাইট্রিক এসিড্ ও পরে এমোনিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। মূল দ্বারা উদ্ভিদগণ ঐ উভয় পদার্থই শোষণ করিতে পারে।

বাখারি চূণ কিরূপে কার্ব্বনেট্ অব লাইমে পরিণত হয়, পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। কার্ব্বনেট্ হইলে চূণের জারক-গুণ বিলুপ্ত হয়, তখন উহাদ্বারা জমির দুইটী উপকার হইয়া

থাকে। প্রথমতঃ চূণের কার্ব্বনেট্ উদ্ভিদ পোষণ না করিলেও মৃত্তিকার অন্যান্য পদার্থকে উদ্ভিদ পোষণোপযোগী করিয়া দেয় এবং মৃত্তিকার অম্লত্ব নষ্ট করে। দ্বিতীয়তঃ উদ্ভিদাদি পচিবার সময় মৃত্তিকায় যে নাইট্রিক এসিড্ জন্মে তৎসংযোগে চূণের কার্ব্বনেট্, নাইট্রেট অব ক্যাল্সিয়াম্ নামক সোরার তুল্য কার্য্যকারী একপ্রকার দ্রবণীয় যৌগিকপদার্থ উৎপাদন করে, উহা অতি উৎকৃষ্ট সার। লাঙ্গল, কোদাল প্রভৃতি কৃষিযন্ত্র দ্বারা মৃত্তিকা যত অধিকবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেওয়া যায়, ততই উহাতে নানা প্রকার নাইট্রাইট ও নাইট্রেট স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে।

অধিক চূণ দিলে কঠিন আটাল মৃত্তিকাও এত শিথিল হইয়া পড়ে যে, তাহাতে কোন ফসল জন্মে না, সুতরাং কয়েক বৎসর সে জমি পতিত রাখিতে হয়। হাল্কা মৃত্তিকা অথবা জঙ্গলাদি কাটিয়া যে জমি আবাদ করা যায়, তাহাতে অধিক চূণ দিলে এত শিথিল হয় ও ফাঁপিয়া উঠে যে, আঘাত করিলে ঢপ্ ঢপ্ শব্দ করে এবং পদভরে বসিয়া যায়। ভূমির এই অবস্থা হইলে তাহাতে অতিরিক্ত চূণ দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ঐরূপ জমিতে প্রায় কোন ফসলই জন্মে না। উহার মৃত্তিকা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, চূণের আধিক্য জন্য মৃত্তিকার উর্ব্বরতা নষ্ট হয় না, কিন্তু উহা অতি শিথিল ও সছিদ্র হওয়ায়, বায়ু প্রবাহ কালে উদ্ভিদাদির মূল ভূমির উপর স্থির থাকিতে পারেনা। রোলারের ন্যায় কোন ভারি বস্তু দিয়া চাপিয়া দিলে বা বৃষ্টির দ্বারা চূণ ধৌত হইলে কিংবা গূঢ় মাটীর নীচে পড়িয়া গেলে

মৃত্তিকাং ক্রমশঃ কঠিন হইয়া যায়। জমির উপর গো মেষের পাল বিচরণ করিলেও মৃত্তিকা কঠিন হয়।

চূণাধিক্য বশতঃ মৃত্তিকা কেন এত শিথিল হয় ও ফাঁপিয়া উঠে, তাহার প্রকৃত কারণ এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। অনেকে এই অনুমান করেন যে, মৃত্তিকায় যে চূণ দেওয়া হয়, কিছুকাল পরে তাহা চূণের কার্ব্বনেটে পরিণত হইয়া যায়। মৃত্তিকাস্থ উদ্ভিজ্জ পদার্থ গলিত হইয়া বায়ু সংযোগে এক প্রকার এসিড্ উৎপাদন করে। কার্ব্বনেট্ অব্ লাইম্ এই এসিড্ সংযোগে কার্ব্বনিক এসিড বাষ্পে পরিণত হয়। সোডা ওয়াটারে এই বাষ্প থাকায় যে কারণে বোতলের কাক খুলিবার সময় উহা সশব্দে বেগে নিক্ষিপ্ত হয় এবং পাঁউরুটীর মধ্যভাগ যে কারণে মৌচাক বা স্পঞ্জের ন্যায় সছিদ্র হয়, সেই কারণে মৃত্তিকার নীচে ঐ বাষ্প জন্মিয়া উপরের মৃত্তিকাকে ফাঁপাইয়া তুলে। কঠিন মৃত্তিকায় এই ফাঁপ বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু হাল্‌কা মৃত্তিকা অনায়াসে ফাঁপিয়া উঠে। যে পর্য্যন্ত চূণ মৃত্তিকা হইতে অপসারিত না হয় বা কৃত্রিম উপায়ে মৃত্তিকা কঠিন না করিয়া দেওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় ফাঁপ থাকে। অন্যস্থান হইতে কঠিন মৃত্তিকা আনিয়া ফাঁপা জমির উপরে দিলে অথবা কর্ষণ দ্বারা নিম্নস্থ মৃত্তিকা উপরে উঠাইয়া দিলে শিথিল মৃত্তিকা দৃঢ়ীকৃত হয়।

চূণসার দিলে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত জমিতে প্রচুর ফসল জন্মে, পরে ক্রমশঃ ফসলের পরিমাণ কমিয়া যায়। মৃত্তিকাস্থ জৈবপদার্থের সহিত চূণ সংযুক্ত হইলে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া যে পদার্থ জন্মে, তাহা

উদ্ভিদগণকে সতেজ ও বৰ্দ্ধিত করে। জৈবপদার্থ ভূমির উর্ব্বরতার প্রধান উপাদান। চূণের শক্তিবিশেষের দ্বারা ভূমির খনিজ উপাদানের কিয়দংশ বিযুক্ত হইয়া উদ্ভিদ-পোষণ করে। জমিতে যত বার ফসল উৎপাদন করা যায়, প্রত্যেকবারে মৃত্তিকার কতকগুলি উপাদান উদ্ভিদমূল দ্বারা আকৃষ্ট হয়। চূণ প্রয়োগ করিলে জমি অতিশয় উর্ব্বরা হয়, কিন্তু উহার জৈব ও অজৈব উভয় পদার্থই অল্পকাল মধ্যে ব্যয়িত হওয়ায় সে উর্ব্বরতা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। আবার জমি অধিক উর্ব্বরা হইলে তাহাতে এক বৎসরে উপর্য্যুপরি দুই তিন বার ফসল উৎপাদন করা আবশ্যক হয়; সুতরাং চূণ প্রয়োগ না করিলে দুই তিন বৎসরে মৃত্তিকার যে সকল উপাদান নিঃশেষিত হইত, চূণ প্রয়োগ করিলে তাহা এক বৎসরেই নিঃশেষিত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই ভূমি অনুর্ব্বরা হয়। কিন্তু কৃষক সুবিজ্ঞ হইলে উপযুক্ত পরিমাণে অন্যান্য সার দিয়া জমির সেই অভাব পূরণ করিতে পারেন।

খনিজ ও লাবণিক সার। নাইট্রোজন, অজৈবপদার্থ ও তদন্তর্গত কতকগুলি উপাদান উদ্ভিদের বিশেষ উপকারী। কোন কোন খনিজ বা লাবণিক পদার্থে ঐ সকল উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় তাহা সাররূপে ব্যবহৃত হয়। জান্তব সার পচিবার সময়ে ঐ সকল উপাদান জন্মে। অনেক বড় বড় নগরে এক্ষণে গ্যাসের আলো ব্যবহৃত হয়। পাথুরিয়া কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তুত হয়। গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময়ে কয়লার অন্তর্গত নাইট্রোজন ও হাইড্রোজন পরস্পর সংযুক্ত হইয়া এমোনিয়া গ্যাস জন্মে। প্রথমতঃ ইহাতে অনেক ময়লা

মিশ্রিত থাকে, পরে পরিষ্কৃত করিবার সময় অধিকাংশ এমোনিয়া ঘনীভূত হয় এবং কার্ব্বনিক এসিড, এসিটিক এসিড, প্রুসিক এসিড, মার্সগ্যাস, আলকাতরা ও অন্যান্য অনেক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার তরল পদার্থের উৎপত্তি হয় তাহাকে "লাইকর এমোনিয়া" বলে। এক মণ ভাল কয়লা হইতে দুই সের লাইকর এমোনিয়া পাওয়া যায় এবং উহার প্রতি পাঁচ সেরে অর্দ্ধ পোয়া হইতে দেড় পোয়া পর্য্যন্ত এমোনিয়া প্রস্তুত হয়। এক সের এমোনিয়া দ্বারা ভূমি যত উর্ব্বরা হয়, চারি সের সলফেট্ অব এমোনিয়া দ্বারাও ভূমি তত উর্ব্বরা হইয়া থাকে। গ্যাসের কারখানায় লাইকর এমোনিয়া হইতে এমোনিয়া, নানাবিধ মনোহর রং এবং সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নগরের পথগুলি জল দিয়া ভিজাইবার জন্য এক প্রকার জলের গাড়ি আছে, ঐরূপ গাড়ি করিয়া চারি পাঁচ গুণ জলমিশ্রিত লাইকর এমোনিয়া ঘাসের জমিতে দিলে প্রচুর ঘাস জন্মে। বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে এই সার জমিতে দিলে প্রথমতঃ ঘাসগুলি দগ্ধবৎ হইয়া যায় পরে বৃষ্টি হইলেই যথেষ্ট ঘাস জন্মে। চারাগুলি যখন ছোট ছোট থাকে সেই সময়ে ধান্য গোধূমাদির জমিতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই সার দেওয়া যায়। ভস্ম, করাতের গুঁড়া প্রভৃতিতে ঐ তরলসার মিশাইয়া মূলকজাতীয় উদ্ভিদের গোড়ায় বা গর্ত্তমধ্যে উহাদের বীজের সহিত পুঁতিয়া দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। লাইকর এমোনিয়া দিবার কয়েকদিন পূর্ব্বেই সে জমিতে অস্থিচূর্ণ বা শুয়ানো সার দেওয়া উচিত।

কার্ব্বনেট্ অব এমোনিয়ার ঘ্রাণ অতিশয় উগ্র। মাথা ধরিলে উহার আঘ্রাণে মাথা ছাড়ে। জল মিশাইয়া জমিতে দিলে উদ্ভিদ সকল সতেজে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু উহার মূল্য এত অধিক যে, সারের জন্য তাহা ব্যবহার করা যায় না। গ্যাসের কারখানায় লাইকর এমোনিয়া হইতে কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া, সলফেট অব এমোনিয়া ও মিউরিয়েট অব এমোনিয়া প্রস্তুত হয়। অর্দ্ধ ছটাক কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া পাঁচ সের জলে গুলিয়া, গোলাপ প্রভৃতি ফুল কিংবা কলমের চারায় দিলে কীটাদি মরিয়া যায় ও চারাগুলি বিলক্ষণ সতেজ হয়। সলফেট অব এমোনিয়ার শতকরা ২৩ ভাগ এমোনিয়া আছে। কিন্তু উহাতে উদ্ভিদের অনিষ্টকারী এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে তাহার নাম "এমোনিক সলফোসিয়ানাইড্"।

সলফেট্ অব এমোনিয়াতে পূর্ব্বোক্ত বিষাক্ত পদার্থ আছে কি না পরীক্ষা দ্বারা তাহা জানা যায়। মিউরিয়েটিক বা হাইড্রোক্লোরিক এসিডে অল্প পরিমাণে লৌহ মরিচা দ্রব করিয়া, অল্প জল মিশ্রিত সলফেট্ অব এমোনিয়ার দ্রবণ সংযোগ করিলে যদি সেই মিশ্র তরল পদার্থ লালবর্ণ হইয়া উঠে, তবে উহাতে ঐ বিষাক্ত পদার্থ বর্ত্তমান আছে বুঝা যায়। যে সকল জমিতে ফস্ফেট্ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু উদ্ভিদের পোষণোপযোগী হইতে হইলে যেরূপ বিকৃত হওয়া আবশ্যক তাহা হয় নাই সুতরাং মৃত্তিকা বা উদ্ভিদের উপর কোন কার্য্য করিতেছে না, কেবল সেই সকল জমিতে কার্ব্বনেট্ অব্ এমোনিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অস্থি বা খইল চূর্ণ ও ভস্ম একত্র মিশাইয়া

নিস্তেজ ও শুষ্কপ্রায় উদ্ভিদের গোড়ায় ছড়াইয়া দিলে চারা গুলি সতেজে বাড়িতে থাকে। ঘাস ও ধান্য জাতীয় ফসলে এই সার দিলে গাছগুলি সতেজ হয়।

অপরিষ্কৃত এমোনিক্ ক্লোরাইড্, সলফেট্ অব এমোনিয়া অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সার। পরিষ্কৃত হইলে উহাতে শতকরা ৩২ ভাগ এমোনিয়া থাকে। উহার লবণাংশ ফসলের কোন উপকার করে না; কিন্তু উহার দ্রবণ, ক্যালসিক্ ফস্ফেট্‌কে কিয়ৎ পরিমাণে দ্রব করিয়া দেয়। বায়ুতে সামান্য পরিমাণে এমোনিয়া আছে। অনেকের বিশ্বাস যে সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া দক্ষিণের বায়ুতে লবণের অংশ আছে। বসন্ত ঋতুর প্রথমে ও শীত ঋতুর শেষে আমাদের দেশে যে দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা বুট ও অরহরের অনিষ্টকারী। বঙ্গদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর আছে, উহার উপর দিয়া উত্তরাভিমুখে মৌসুমীবায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, অতএব উক্ত বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। এমোনিয়া ঘটিত সকল প্রকার লাবণিক পদার্থই ধান্যজাতীয় ফসলের বড় উপকারী তদ্দ্বারা ধান্য জাতীয় ফসলের ফলন বাড়ে। খনিজ সার অন্যান্য সারের সহিত মিশাইয়া জমিতে না দিলে শস্যের দানা কিছু বড় ও ভারী হয়। ঘাসের জমির পক্ষেও ইহা উৎকৃষ্ট সার, কিন্তু শিম্বী জাতীয় ফসলের বিশেষ উপকার করে না।

এমোনিয়া ঘটিত লবণসার, শাকসবজীর উপযুক্ত নহে। ফস্ফেটসারের সহিত উহা মিশাইয়া দিলে মূলকজাতীয় উদ্ভিদের উপকার করে বটে, কিন্তু উহা সচরাচর অন্যান্য

সারের সহিত মিশাইয়া বিঘা প্রতি ১৭ বা ১৮ সের দিতে হয়। সলফেট্ অব্ এমোনিয়া গ্রীষ্মকালে জমিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ তখন মৃত্তিকা হালকা এবং সছিদ্র থাকে, কিন্তু বর্ষার সময় উহা ধৌত হইয়া যাইতে পারে। এমোনিয়া ঘটিত যে সকল লবণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে মিউরিয়েট্ অব্ এমোনিয়া ও সলফেট্ অব্ এমোনিয়ায় অসাধারণ অঙ্কুরোৎ-পাদিকা শক্তি আছে। প্রথমোক্তটীর প্রচলিত নাম নিষেদল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নিষেদল মিশ্রিত জলে গমের বীজ কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া বপন করিলে পাঁচ সপ্তাহ মধ্যে চারাগুলি এত বড় হয় যে, তাহাদের কাণ্ডে দশ বারটী গ্রন্থি জন্মে কিন্তু ঐ রূপ করিয়া বীজ না ভিজাইয়া বপন করিলে, সেই জমিতে সেই সময় মধ্যে যে চারা হয় তাহার কাণ্ডে কেবল তিন চারিটীর অধিক গ্রন্থি জন্মেনা।

গ্যাস পরিষ্কার করিবার জন্য গ্যাসের কারখানায় অনেক চূণ ব্যবহৃত হয়। গ্যাস পরিষ্করণকার্য্য শেষ হইলে যে চূণ পাত্রাদির নীচে পড়িয়া থাকে তাহা "ক্যালসিক্ হাইড্রেট" ও "ক্যালসিক্ কার্ব্বনেট্"; উহাতে অল্পমাত্রায় জিপসম্ ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে এবং এমোনিয়া প্রায়ই তাহাতে থাকে না। এই সার ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে কিছু দিন পর্য্যন্ত উহা অনাবৃত স্থানে রাখা আবশ্যক, তৎপরে জমিতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তখন ফসলের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। সাবান ও চামড়া পরিষ্কারের কারখানায় ব্যবহৃত ও নষ্টপ্রায় চূণ কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করাই ভাল, কারণ উহা অল্প মূল্যের

পাওয়া যায়। গ্যাসের কারখানায় নানা প্রকার এমোনিয়া-দ্রবণ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহাও সার রূপে জমিতে প্রয়োগ করা যায়।

সোডিক্ নাইট্রেট্। উর্ব্বরা ভূমি মাত্রেই নাইট্রিক এসিড্ ক্যাল্সিক্ নাইট্রেট রূপে বর্ত্তমান থাকে, ইহা এমোনিয়ার লবণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সার। "পটাসিক্ নাইট্রেট্"কে সচরাচর সোরা কহে। ভারতবর্ষের স্থান বিশেষে মৃত্তিকার উপর উহা স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। মূল্য অধিক বলিয়া উহা কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করা যায় না। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত, পেরু, চিলি ও ব্রেজিল দেশে এক প্রকার অপরিষ্কৃত সোডিক্ নাইট্রেট্ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। উহা হইতে মৃত্তিকা ও অন্যান্য ময়লা পরিষ্কার করিয়া গন্ধক দ্রাবক প্রস্তুত ও জমিতে সার দিবার জন্য ইউরোপের নানা দেশে প্রেরিত হয়। উহাতে শতকরা ১৫ বা ১৬ ভাগ নাইট্রোজন আছে। এজন্য যে সকল ফসলের উপকরণ নাইট্রোজন সেই সকল ফসলের জমিতে এই সার দেওয়া উচিত। এই সার প্রয়োগে শস্যের ফলন বাড়ে ও চারাগুলি সতেজ হয়। আবশ্যক হইলে জিপসম্ ও পটাস সল্টের সহিত উহা মিশ্রিত করিয়া জমিতে দেওয়া যাইতে পারে।

জিপসম্ বা ক্যালসিক্ ফস্ফেট্। পশুচারণ জন্য ঘাসের জমিতে এই সার বড় উপকারী। মৃত্তিকায় চূণ ও সল্ফিউরিক এসিডের অভাব ইহা দ্বারা পূরিত হয় এবং শিম্বীজাতীয় ফসলের পক্ষেও ইহা অতি উত্তম সার। উদ্ভিদগণ ইহা হইতে চূণ, ম্যাগনেসিয়া ও পটাস প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। জিপসম্

কোন কোন জমির কিছুই উপকার করে না, আবার কোন কোন জমিতে উহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যে মৃত্তিকায় স্বভাবতঃই জিপসম্ আছে তাহাতে উহা প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে না। মৃত্তিকাস্থ পটাসিক্ সিলিকেট্ ও সোডা পটাসের বিশ্লেষণ করিয়া, উহা জমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করে। খনিজ সুপারফস্ফেট্ সারের শতকরা ৫০ ভাগ জিপসম্।

ম্যাগনেসিক্ সল্‌ফেট্। কোন কোন সার প্রস্তুত জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ধান্যজাতীয় ফসলের ইহা একটী প্রধান উপাদান। প্রায় সকল সারেই ম্যাগনেসিক্ কার্ব্বনেট্ বা ম্যাগনেসিক্ ফস্ফেট অল্প পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। চূণাপাথরেও উহার অংশ বিদ্যমান আছে।

পটাস্-সল্ট। প্রায় যাবতীয় উদ্ভিদে এই পদার্থ অধিক, এজন্য উদ্ভিদ ভস্মেও ইহার পরিমাণ অধিক দেখা যায়। অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা ফসলসমূহ মৃত্তিকা হইতে পটাস অধিক মাত্রায় শোষণ করে। কেবল মাত্র গোবরসার দিয়া জমির সে অভাব পূরণ করা যায় না। মিশ্রসার এরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে যে, মৃত্তিকা হইতে আকৃষ্ট পটাসের অভাব তদ্দ্বারা সম্যক পূরিত হইতে পারে। অন্য সারের সহিত মিশ্রিত না করিলে পটাস-সল্ট ধান্যজাতীয় ফসলের কোন উপকার করে না; অতএব মিশ্রসার ব্যবহার করিলেই উহার সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। এই সার, হাল্‌কা মৃত্তিকায় অধিকতর উপযোগী।

লবণ বা সোডিক্ ক্লোরাইড্। এই সার মূলকজাতীয়

ফসলে দেওয়া হইয়া থাকে, জমির আগাছা ও কীটাদি উহা দ্বারা নষ্ট হয় ও ফসলের ফলন বাড়ে। ইদানীন্তন কৃষিবিজ্ঞগণের মধ্যে লবণের ঐ সকল গুণ থাকা সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। ধান্যজাতীয় ফসল পাতাইয়া যাইবার সম্ভাবনা হইলে লবণ প্রয়োগে তাহা নিবারিত হয়, ইহাই লবণের একটি বিশেষ গুণ। লবণমিশ্রিত জলে ক্যাল্‌সিক্‌ফস্ফেট্ দ্রবীভূত হয় এবং গোবর প্রভৃতি সারের অদ্রবণীয় অংশ হইতে নাইট্রোজন বিযুক্ত করিয়া দেয়।

চারি সের অস্থি অঙ্গার অথবা অস্থি ভস্ম এক সের সলফিউরিক এসিডে দ্রব করিলে "সুপার ফস্ফেট্ অব্ লাইম" নামক সার প্রস্তুত হয়। এক ভাগ মিউরিয়েট্ অব এমোনিয়া বা নিষেদল ও এক ভাগ সলফেট্ অব এমোনিয়া মিশ্রিত করিলে "এমোনিয়া-সল্ট" নামক সার প্রস্তুত হয়। এই সার জমিতে দিলে সোরা প্রয়োগের তুল্য ফল পাওয়া যায়। মিশ্রসারের মধ্যে এই দুইটী প্রধান। সিলিকা, ধান্যজাতীয় উদ্ভিদের একটি প্রধান উপাদান, এজন্য পটাসসিলিকেট ও সোডাসিলিকেট্ কখন কখন ধান্যজাতীয় ফসলের সার রূপে ব্যবহৃত হয়। যে সকল উদ্ভিদের পত্র স্পর্শে কর্কশত্ব অনুভব হয়, তাহাতে সিলিকা আছে জানা যায়, আর যে সকল উদ্ভিদের পত্র কোমলস্পর্শ, তাহাতে সিলিকার অংশ প্রায় থাকেনা বলিলেই হয়।

ফসলের পর্য্যায়ক্রম। এক খণ্ড জমিতে কিছু কালের জন্য ক্রমাগত এক প্রকার ফসল উৎপাদন করিলে ভূমির কতকগুলি উপাদান অল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া জমি

অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে। নাইট্রোজেন সেই সকল উপাদানের মধ্যে প্রধান। কতকগুলি ফসল ভূমি হইতে অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন ও অল্প মাত্রায় খনিজ পদার্থ এবং কতকগুলি ফসল অল্প মাত্রায় নাইট্রোজেন ও অধিক মাত্রায় খনিজ পদার্থ শোষণ করে। যদি এক খণ্ড জমিতে দুই জাতীয় ফসলের বীজ বপন করা যায় তবে এরূপ হইতে পারে যে তাহাদের মধ্যে এক জাতীয় ফসল মৃত্তিকার পটাস ও ফস্ফরিক্ এসিড্ অধিক মাত্রায় শোষণ করে, কিন্তু মৃত্তিকার অন্যান্য উপাদান ভূমিতে যেরূপ আছে সেইরূপই থাকে।

এক জাতীয় ফসলের মূল, মৃত্তিকার ৬ ইঞ্চির অধিক নিম্নে প্রবেশ করে না, অন্য জাতীয় ফসলের মূল হয়ত এক ফুট মৃত্তিকার নিম্নে প্রবেশ করিয়া উপরিস্থ ৬ ইঞ্চি গভীর মৃত্তিকাতে যে সকল উপাদান আছে তাহা স্পর্শ না করিয়া নিম্নস্থ ৬ ইঞ্চি মৃত্তিকাতে যে উপাদান আছে তাহাই শোষণ করে। এই রূপে দুই জাতীয় ফসলই উত্তমরূপে জন্মিতে পারে অথচ ভূমির উর্ব্বরতা নষ্ট হয় না। পুনঃপুনঃ এক জাতীয় ফসল উৎপাদন করিলে যে ভূমি দশ বৎসরে নিস্তেজ হইয়া পড়িত, পর্য্যায়ক্রমে ফসল উৎপাদন করিলে তাহা কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত উর্ব্বরা থাকিতে পারে। কৃষিকার্য্যে এই প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য এবং ইহাকেই ফসলের পর্য্যায়ক্রম বলা যায়। এই প্রণালী অনুসারে চাষ করিলে ভূমি অধিক কাল পর্য্যন্ত উর্ব্বরা থাকিতে পারে। এতদ্দারা জমিতে সার প্রয়োগের তুল্য ফল পাওয়া যায় বলিয়া, সারের অধ্যায়েই ইহাকে সন্নিবেশিত করা গেল।

কোন জমিতে উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর ধান্যজাতীয় ফসল উৎপাদন করিয়া পরবর্ত্তী ২।৩ বৎসর শিম্বীজাতীয় ফসল উৎপাদন করা উচিত। এ দেশের কৃষকগণ জানিয়া শুনিয়া যদিও কেহ এই প্রণালীর অনুসরণ করে না, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা উহার ফল প্রাপ্ত হয়। এদেশের ভূমি এত উর্ব্বরা যে একখণ্ড জমিতে বৎসরে ২।৩ প্রকার ফসল জন্মিতে পারে। ধান্য ও রবিশস্য এক জমিতেই বৎসরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উৎপাদিত হয়। বৎসরের প্রথম ছয় মাস ধান্য, পাট, শণ, তিল প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া, শেষ ছয় মাসে রবিশস্য উৎপাদন করা যায়। কিন্তু ফসলের প্রকৃতি, ভূমির উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি ও উৎপাদিত শস্যাদি স্বদেশের প্রয়োজনানুরূপ হইতেছে কি না, বিবেচক কৃষক মাত্রেরই এই তিন বিষয়ের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

ইক্ষু, পাট, শণ প্রভৃতি কতকগুলি ফসল অল্পকাল মধ্যেই ভূমি অসার করিয়া ফেলে। এজন্য ঐ সকল ফসলের চাষ অধিক করা উচিত নহে এবং যে ভূমিতে উহা উৎপাদন করা হয় বিশেষ সতর্কতা ও বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাতে উপযুক্ত সার প্রয়োগ করা অথবা ২।১ বৎসরের জন্য উহা পতিত রাখা কর্ত্তব্য। বিগত কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালার উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে প্রজাগণ যত্নপূর্ব্বক পাটের চাষ করিতেছে। উপর্য্যুপরি এরূপ করিলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হয়। পাটের চাষ আয়াসসাধ্য, এবং লাভ-জনক। এক বিঘায় উৎপন্ন সিরাজগঞ্জ পাটের মূল্য পঞ্চাশ

টাকার কম নহে বরং কখন কখন অধিক; সুতরাং আশু লাভজনক বলিয়া কৃষকগণ ইহার চাষে যত্নবান হয়। এরূপ না করিয়া যে জমিতে পাট আবাদ করা হয়, সে জমিতে কোন রকম ঘাস, মটর কলাই বা আলু, মূলা, শালগম প্রভৃতি ফসলের চাষ করিয়া যদি তদ্দারা প্রতি বিঘায় দশ টাকাও আয় হয় তাহাই যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপে দশ টাকা লাভ যে সহস্রগুণে ভাল, তাহা কেবল কৃষকগণ নহে, জমিদার, প্রজা ও অপর সাধারণ সকল লোকেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

মৃত্তিকার অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা নাইট্রোজনের অপচয় সহজেই হইয়া যায়। প্রকৃতিদেবী এই অপচয় পূরণার্থ যে কৌশল করিয়া রাখিয়াছেন তাহা অতি অদ্ভুত। সমুদ্র হইতে যে বাষ্পকণা উঠিয়া মেঘের আকার ধারণ করে, তাহার জল স্বাদ, গন্ধবিহীন চোঁয়ান জল মাত্র, কোন ময়লা তাহাতে থাকে না। ভূবায়ুতে নাইট্রোজন অদ্রবণীয় যৌগিক অবস্থায় আছে, কিন্তু বিকৃত না হইলে উহা জলে গলে না। কিন্তু যদি অতি প্রবল তাড়িত-স্রোত বায়ু মধ্য দিয়া পরিচালিত করা যায় তবে উহার অন্তর্গত নাইট্রোজন বিকৃত হইয়া বিযুক্ত ও দ্রবণীয় হয়। এই সময় যদি জল সংস্পর্শ হয় তবে তাহাতে নাইট্রোজন গলিয়া যায়।

মেঘ ভূতল হইতে ৩।৪ মাইল উপরে থাকে, তথা হইতে এক বিন্দু পরিষ্কার জলের ৩।৪ মাইল পথ অতিক্রম করিতে যে সময় আবশ্যক, সেই সময়ের মধ্যে যদি আকাশে ৩.৪ বার বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় তবে বায়ুর নাইট্রোজনের কিয়দংশ বিশ্লিষ্ট

হয় ও বৃষ্টিবিন্দুর সহিত দ্রব হইয়া ভূতলে আসিয়া পড়ে। মৃত্তিকায় পটাস ও সোডা স্বভাবতঃই অল্প পরিমাণে আছে তদ্ব্যতীত অন্যান্য পদার্থও আছে, নাইট্রোজন ঐ সকল পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় অবস্থায় থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত অপচয়ের পূরণ করিয়া থাকে। নগর বা পল্লীস্থ পুরাতন ঘরের দেওয়ালে যে লোণা ধরে তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন, তাহাও সোরা। এজন্য পুরাতন দেওয়াল ভাঙ্গা মৃত্তিকা, নটে, পালং প্রভৃতি শাক ও বেগুণ, তামাক প্রভৃতির জমিতে সার দেওয়া হয়।

ধান্য জাতীয় অপেক্ষা শিম্বীজাতীয় ফসল অধিকমাত্রায় নাইট্রোজন শোষণ করে। উৎকৃষ্ট জমিতে স্বভাবতঃ নাইট্রোজন অল্প পরিমাণে সঞ্চিত হয় কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা ধৌত হইয়া উহা মৃত্তিকার নীচে চলিয়া গেলে তদ্দ্বারা ফসলের কোন উপকার হয় না। যে উপায়ে উহা মৃত্তিকার নীচে না যাইয়া অদ্রবণীয় অবস্থায় উপরেই থাকে তাহাই করা কর্ত্তব্য। ঐ জমিতে যদি গো মেষাদি পশুর খাদ্য কোন জাতীয় ঘাস বা মূলক জাতীয় ফসল উৎপাদন করিয়া তাহাতে পশুচারণ করা যায় তবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। পশুগণও বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, গাভীগণ অধিকতর দুগ্ধবতী হয় এবং পশুগণের পরিত্যক্ত মল মূত্রে নাইট্রোজন জমির উপরে এরূপভাবে থাকিয়া যায় যে পর বৎসরে তাহা ধান্যজাতীয় ফসলের বিশেষ উপকার করিতে পারে।

রাজসাহী বিভাগের কৃষকগণ ধান্যছেদনের সময় কেবল উহার শীষগুলি কাটিয়া লইয়া প্রায় সমস্ত বিচালি জমিতেই

রাখিয়া দেয়, পরে স্ব স্ব পশুপাল দ্বারা জমিতেই উহা খাওয়াইয়া দেয়। বর্দ্ধমান বিভাগের কৃষকগণ সেরূপ করে না, তাহারা ধান ঝাড়ের আমূল কাটিয়া লয়, পরে সেই জমিতে মটর, মসুর প্রভৃতির বীজ বপন করিয়া রাখিয়া দেয়। চারাগুলি বড় হইলে নিকটস্থ গোয়ালাদিগকে ঘাসকর বিক্রয় করিয়া ফেলে। গোয়ালাগণ স্ব স্ব গো মেষাদি আনিয়া জমিতেই উহা খাওয়াইয়া দেয়। এইরূপ করিলে ভূমি শীঘ্রই অনুর্ব্বরা হইতে পারেনা এবং কৃষকগণও ঘাসকরের আয় হইতে জমির রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারে এবং একদ্বারা পর্য্যায় বপনের ফল প্রাপ্ত হয়।

---

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY HARI DAS GHOSH, AT THE GREAT TOWN PRESS.
163, Musjeedbari Street, Calcutta,

# পরিশিষ্ট।

অববাহিকা প্রদেশ—বৃষ্টি বা প্রস্রবণাদির জল যে ভূভাগের উপর দিয়া নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া কোন নদীতে পড়ে, অথবা কোন নদীর উভয় পার্শ্বস্থ ক্রমনিম্ন ভূভাগ।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—এক ঘন ইঞ্চি চৌয়ান জলের ওজনের সহিত এক ঘন ইঞ্চি অন্য কোন বস্তুর ওজনের তুলনা বা অনুপাতকে তাহার আপেক্ষিক ভার কহে। পূর্ব্বোক্ত জলের ওজন যদি এক ছটাক হয় ও শেষোক্ত বস্তুর ওজন যদি তিন ছটাক হয়, তবে শেষের পদার্থের আপেক্ষিক ভার তিন হইবে। সমায়তনের কঠিন, তরল ও বায়বীয় সকল বস্তুর ভারতুলনা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

ইথার—জল অপেক্ষাও লঘু এক প্রকার তরল পদার্থ। এক ভাগ সুরাসার ও এক ভাগ গন্ধকদ্রাবক চৌয়াইয়া ইহা প্রস্তুত করা যায়। ফুটী, আনারস প্রভৃতি ফলে অত্যল্প পরিমাণে ইথার আছে।

উষ্ণশোণিত বিশিষ্ট প্রাণী—প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ জীবসমূহের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণানুসারে তাহাদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জীব এবং অণ্ডজ জীবের মধ্যে পক্ষী জাতিকে উষ্ণশোণিতবিশিষ্ট জীব কহে। মৎস্য, সরীসৃপ, ভেক ও কীট পতঙ্গাদিকে শীতল-শোণিতবিশিষ্ট জীব কহে।

**এমোনিয়া**—চূণ ও নিষেদল মিশ্রিত করিলে, তীব্র গন্ধযুক্ত এক প্রকার অদৃশ্য বাষ্প উত্থিত হয়, উহাই এমোনিয়া। ১৪ ভাগ নাইট্রোজন ও ৩ ভাগ হাইড্রোজন সংযোগে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

**কাষ্ঠতন্তু**—চুলের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম অংশ দ্বারা কাষ্ঠ গঠিত হয়। উদ্ভিদ কোষাদি অংশ দ্বারা নির্ম্মিত। উহা শ্বেতবর্ণ, স্বাদগন্ধ বিহীন এবং জল, স্পিরিট বা ইথারে দ্রবণীয় নহে। কোন কোন বৃক্ষমজ্জা ও তুলা কাষ্ঠতন্তুর উদাহরণ।

**কেসিন্**—দুগ্ধের ইহা একটি প্রধান উপকরণ। ছানার তৈলময় পদার্থ ও ঘৃত কিয়ৎপরিমাণে মিশ্রিত থাকে। স্পিরিট সংযোগে ছানার ঐ সকল বস্তু পৃথক করিলে যাহা থাকে তাহাকেই কেসিন বলে। নানাবিধ ফল, মূল ও শস্যাদিতে উহা দেখিতে পাওয়া যায়।

**কার্ব্বো হাইড্রেট**—যে সকল উদ্ভিদে শ্বেতসার, কাষ্ঠতন্তু ও অল্পমাত্রায় শর্করা আছে তাহার সাধারণ নাম কার্ব্বো হাইড্রেট্। উহা অক্সিজন, হাইড্রোজন ও অঙ্গার বা কার্ব্বন এই কয়টী মূলপদার্থসংযোগে উৎপন্ন। অঙ্গার ও জল শর্করার উপাদান। ইক্ষুশর্করা বিয়োজন করিলে ১২ ভাগ কার্ব্বন ২২ ভাগ হাইড্রোজন ও ১১ ভাগ অক্সিজন পাওয়া যায়। শেষোক্ত দুইটি পদার্থ সংযোগে জলের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সে জল চিনিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। শর্করা হইতে অঙ্গার পৃথক করিলেই জল প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। কার্ব্বো হাইড্রেট মাত্রেই শারীরিক তাপোৎপাদক।

**ক্লোরোফরম্**—ইহা এক প্রকার অতিশয় শ্বাসরোধক

তরল পদার্থ। ইহার ঘ্রাণে জীবগণ চেতনাশূন্য হইয়া পড়ে এজন্য ডাক্তারেরা উৎকট অস্ত্র চিকিৎসায় ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। কর্পূর, রবর, ধুনা ও মম প্রভৃতি কতক-গুলি পদার্থ ক্লোরোফরম্ সংযোগে গলিয়া যায়। অর্দ্ধসের অকসি-ক্লোরাইড্ অব ক্যালসিয়ম দেড় সের জল ও দেড় সের সুরাসার (এলকোহল) মিশ্রিত করিয়া বকযন্ত্রে চোঁয়াইলে দেড় ছটাক ক্লোরোফরম্ প্রস্তুত হয়।

খনিজ পদার্থ—সোডা, চূণ, লবণ, ম্যাগনেসিয়া, পটাস, সোরা প্রভৃতি পদার্থকে খনিজ বা আকরিক পদার্থ কহে।

জিপসম্—ক্যালসিয়ম নামক মূল পদার্থ ও গন্ধক সংযোগে উৎপন্ন এক প্রকার যৌগিক পদার্থ। সোডিয়ম যেমন লবণের উপাদান ক্যালসিয়ম সেইরূপ চূণের উপাদান।

জৈব, অজৈব—যে সকল পদার্থে জীব ও উদ্ভিদ দেহ গঠিত তাহার মধ্যে কতকগুলি আগুনে পোড়ে ও কতকগুলি পোড়ে না। পূর্ব্বোক্ত পদার্থকে জৈব (অর্গানিক) এবং শেষোক্ত পদার্থকে অজৈব (ইনরগানিক) কহে।

তাপমান, দ্রবণ-বিন্দু—যে পরিমাণ তাপ দিলে কোন কঠিন বস্তু গলিতে আরম্ভ হয় তাহাকে ঐ বস্তুর দ্রবণ-বিন্দু কহে। যে যন্ত্র দ্বারা তাপের পরিমাণ সূক্ষ্মরূপে স্থির করা যায় তাহাকে তাপমান (থার্ম্মোমিটার) যন্ত্র কহে। ফাঁপা ও বায়ুশূন্য একটি কাচের নলের নীচে পারদ পূর্ণ কুণ্ড আছে। পারদ উষ্ণ বা শীতল হইলে হইলে নলের ঊর্দ্ধ বা অধোভাগে উঠিতে বা নামিতে থাকে, তদ্দ্বারাই তাপের

পরিমাণ ঠিক করা যায়। সচরাচর ফারেন হিট্ ও সেন্টি-গ্রেড্ নামক দুই প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**দ্রবণীয়, অদ্রবণীয়**—যে বস্তু জল বা কোন প্রকার এসিডে গলিয়া যায় তাহাকে দ্রবণীয় ও যাহা ঐরূপে গলে না তাহাকে অদ্রবণীয় বলে। অদ্রবণীয় পদার্থ পচিলে বা বিকৃত হইলে তখন দ্রবণীয় হইতে পারে।

**নাইট্রোজন, নাইট্রিক-এসিড্ ইত্যাদি**—নাইট্রোজন এক প্রকার শ্বাসরোধক বায়বীয় মূল পদার্থ। ভূবায়ুর শতকরা ৮০ ভাগ নাইট্রোজন। জ্বলন্ত বাতি এই বাষ্পে ধরিলে তাহা তৎক্ষণাৎ নিবিয়া যায়। সোরা ও গন্ধকদ্রাবক মিশাইয়া বকযন্ত্রে চোঁয়াইলে নাইট্রিক এসিড্ প্রস্তুত হয়। ১৪ ভাগ নাইট্রোজন ও ৪০ ভাগ অক্সিজন সংযোগে নাইট্রিক পেণ্টাক্সাইড্ জন্মে, তাহাতে জল মিশাইলেও এই এসিড প্রস্তুত হয়। সোডা, পটাস, ক্যালসিয়ম প্রভৃতির সহিত এই এসিড সংযুক্ত হইলে যথাক্রমে সোডিক নাইট্রেট্, পটাসিক নাইট্রেট (সোরা) ক্যাল্‌সিক নাইট্রেট প্রভৃতি যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অক্সিজেনের মাত্রায় ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত ঐ এসিডকে নাইট্রিক ও নাইট্রস কহে। নাইট্রিক এসিড হইতে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ-সমূহের সাধারণ নাম "নাইট্রেট" ও শেষোক্ত এসিড্ হইতে যে যৌগিক পদার্থ জন্মে তাহাকে "নাইট্রাইট্" কহে।

**নিয়মিত ধাতবস্ফটিক**—সোরা, লবণ, চিনি ও ফট্‌কিরি প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য জলে গুলিয়া অগ্নিতে ফুটাইয়া রাখিলে কিছুকাল পরে দানা বাঁধিতে আরম্ভ হয়।

ঐ দানাগুলির গঠন নানারূপ হইয়া থাকে। গঠনগুলির বাহু ও পৃষ্ঠ পরিমাণ সমান হইলে তাহাদিগকে নিয়মিত আকার বিশিষ্ট কহা যায়। কাচ বা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ প্রস্তরের ন্যায় পদার্থকে স্ফটিক কহে। ভূগর্ভে নানাপ্রকার প্রস্তর উল্লিখিতরূপে গঠিত হইয়া থাকে।

পটাস—ইহা ক্ষারধর্মাক্রান্ত এক প্রকার মূল পদার্থ। মৃত্তিকায় ইহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ইহা সচরাচর অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া যৌগিক অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে।

পরমাণু—পদার্থ সমূহের অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশকে অণু বা পরমাণু কহে।

ফস্ফরাস্, ফস্ফরিক এসিড্—হাড়ভস্ম হইতে পীতাভ মমের ন্যায় এক প্রকার মূল পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহাকে ফস্ফরাস কহে। ইহা অন্ধকার স্থানে দীপ্তি পায়, বায়ুতে রাখিলে প্রধূমিত হয় ও সামান্য ঘর্ষণে জ্বলিয়া উঠে এজন্য উহা জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। বিলাতী দেসলাই ইহা দ্বারা প্রস্তুত হয়। ফস্ফরিক এসিড অতিশয় অম্ল ও জারক পদার্থ। ফস্ফরাস্ জ্বালাইলে শ্বেতবর্ণের ধূমা উঠে তাহাতে জল মিশাইলে ফস্ফরিক এসিড্ প্রস্তুত হয়। চূণ, ম্যাগনেসিয়া ও পটাস প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়া যে যৌগিক পদার্থ জন্মে তাহাকে যথাক্রমে ক্যালসিক ফস্ফেট, ম্যাগনেসিক ফস্ফেট ও পটাসিক ফস্ফেট কহিয়া থাকে।

বৃষ্টিমান যন্ত্র (রেনগেজ)—কৃষিকার্য্যে এই যন্ত্রের অত্যন্ত প্রয়োজন। বোতলে তৈল ঢালিবার জন্য টিনের এক প্রকার চুঙ্গি দেখা যায় ইংরাজীতে উহাকে “ফনেল্” কহে।

ফনেলের পরিধি এরূপ হওয়া চাই যে তাহার ভিতর দিকের পৃষ্ঠফল একবর্গ ফুট হইবে ও উহার নীচে একটী খালি বোতল রাখিবে। বৃষ্টির সময় ঐ ফনেলে যে জল পড়িবে তাহা গড়াইয়া গিয়া বোতলমধ্যে সঞ্চিত হইবে। ২৪ ঘণ্টা কাল মধ্যে বোতলে যতটুকু জল জমে তাহা একটি কাচের গ্লাসে ঢালিলে, সে দিন কত ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়াছে ঠিক জানা যাইবে। গ্লাসের গায়ে ছোট ছোট কতকগুলি দাগ কাটা থাকে, ইহার মূল্যও অতি অল্প।

ভূতত্ত্ব—ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকাস্তরাদির প্রকৃতি ও উৎপত্তি বিষয়ক জ্ঞান যাহা দ্বারা লাভ করা যায় তাহাকে ভূতত্ত্ব কহে।

মূল ও যৌগিক পদার্থ—যাবতীয় পদার্থই পরমাণু সমষ্টি মাত্র; বিয়োজন করিলে যাহাতে একাধিক রকমের পরমাণু দেখা যায় না তাহাকে মূল পদার্থ, আর যাহাতে একাধিক প্রকার পরমাণু দেখা যায় তাহাকে যৌগিক পদার্থ কহে। মৃত্তিকা, জল, বায়ু যৌগিক পদার্থ, যে পদার্থ সংযোগে জল বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে তাহাকেই মূল পদার্থ বলা যায়।

ম্যাগনেসিয়া—এক প্রকার শ্বেতবর্ণ যৌগিক পদার্থ। অকসিজেন ও ম্যাগনেসিয়ম নামক মূল পদার্থ সংযোগে ইহা উৎপন্ন হয়।

মৌসুমী বায়ু—বিষুবরেখার নিকটস্থ প্রদেশ ইহার উৎপত্তি স্থান। বাণিজ্যের উপকার হয় বলিয়া স্থানবিশেষে ইহাকে বাণিজ্য বায়ুও কহে। বঙ্গোপসাগরে বৎসরের মধ্যে ৬ মাস উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে ও ৬ মাস দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে

প্রবাহিত হয়। আমরা শীতকালে যে উত্তরে বাতাস ও গ্রীষ্মকালে দক্ষিণবাতাস অনুভব করি তাহাও মৌসুমী বায়ু।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ, রাসায়নিক সংযোগ—এক বস্তু অন্য বস্তুর সংযোগে যে বিকার প্রাপ্ত হয় তাহাকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ কহে। দুগ্ধ অম্ল সংযোগে দধি হইয়া যায় ও দুগ্ধের মৌলিক উপাদানগুলি পৃথক হইয়া পড়ে, ইহাকেই বিশ্লেষণ বা বিয়োজন কহে। কিন্তু জল ও তৈল কিংবা বালি ও মৃত্তিকা পরস্পর মিশাইলে কোন বস্তুরই বিকার জন্মে না এজন্য ঐরূপ সংযোগের ফলকে বিশ্লেষণ বলে না। আবার হাইড্রোজন ও অকসিজেন কোন নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে সংযুক্ত হইলে জল উৎপন্ন হয়, পূর্ব্বোক্ত উভয় পদার্থ হইতে জল একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। একাধিক মূল পদার্থের এইরূপ মিলনকে রাসায়নিক সংযোগ কহা যায়।

রোলার—ইহা প্রস্তর বা লৌহ নির্ম্মিত থামের ন্যায় গোলাকার এবং অত্যন্ত ভারি। রাস্তার ইট বা পাথর কুচি সমান করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লবণ, লাবণিক পদার্থ—কোন ধাতু বা উপধাতু এসিড সংযোগে যে পদার্থ উৎপাদন করে তাহার রাসায়নিক নাম লবণ। তুঁতে ও হিরাকশকে ধাতবিক লবণ কহে। সেইরূপ সোরা, লবণ, নিষেদল, ফটকিরি প্রভৃতিকেও সাধারণতঃ লবণ কহা যায়।

লাকটিন্—কীল, মূল, ইক্ষু, খেজুর, দ্রাক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য হইতে শর্করা প্রস্তুত হইয়া থাকে। নানা জাতীয় শর্করার গুণেরও কিছু পার্থক্য হইয়া থাকে।

দুগ্ধ হইতে এক প্রকার চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে তাহার নাম ক্ষীরশর্করা বা লাকটিন্। উহার দানা অতি ক্ষুদ্র ও কঠিন এবং উহার ছয় গুণ জলে দ্রবণীয়। ইক্ষু ও দ্রাক্ষাশর্করা সহজেই বিকৃত হইয়া যায় কিন্তু ক্ষীরশর্করা সেরূপ হয় না অন্যান্য শর্করা অপেক্ষা ইহার মিষ্টতা অল্প, কিন্তু পুষ্টিকারিতা অধিক।

সলফিউরিক এসিড (গন্ধক দ্রাবক)—ইহা তৈলের ন্যায় অতিশয় অম্ল ও ক্ষারক পদার্থ, গন্ধক হইতে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তৃণ বা কাষ্ঠখণ্ড এই এসিডে নিমজ্জিত করিলে তাহা পুড়িয়া কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং বহুবিধ জৈব ও অজৈব পদার্থ উহাতে গলিয়া যায়। পটাস, সোডা, ম্যাগনেসিয়া, এমোনিয়া প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হইলে ঐ সকল পদার্থের সলফেট নামক যৌগিক পদার্থ জন্মে। যথা সলফেট অব এমোনিয়া ইত্যাদি।

সোডা—ইহা ক্ষারের ন্যায় এক প্রকার শ্বেতবর্ণ মূল পদার্থ, কৃষি ও শিল্পকার্য্যে ইহার ব্যবহার অত্যন্ত অধিক। আমরা যে লবণ ব্যবহার করি তাহার সহিত কোন প্রকার এসিডের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিলে লবণ হইতে সোডা পৃথক হইয়া পড়ে।